একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি

এই অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত ও বদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য, সাধু পুরুষের লক্ষণাদি এবং ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধবের কাছে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধব বদ্ধ এবং মুক্ত জীবের সম্পর্কে প্রশ্নাদি উত্থাপন করেছিলেন। পরম শক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, চিন্ময় আত্মা যদিও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, তবে আত্মার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ প্রকৃতির কারণে, তাকে জড়া প্রকৃতির সংসর্গে পতিত হতে হয়, যে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে চিন্ময় আত্মাকে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের আবরণাত্মক উপাধি স্বীকার করে নিতে হয়। এইভাবে অবিস্মরণীয় কাল থেকেই আত্মাকে বন্ধনদশা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যখন সে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি মূলক সেবা অনুশীলনের আশ্রয় লাভ করে, তখন সে নিত্যমুক্ত মর্যাদা অর্জন করে। সুতরাং পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান অর্জন করার ফলেই জীবের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, এবং অজ্ঞানতাই তার বন্ধনদশার কারণ হয়ে ওঠে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার উভয় প্রকার বৈশিষ্টাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াবলে উৎপন্ন হয় এবং সেই সবই তাঁর নিত্য শক্তিরাজি। জীবগণ প্রকৃতির গুণাবলীতে আকৃষ্ট হলে মিথ্যা অহমিকায় বিভ্রান্ত হয়, যার পরিণামে তারা দুঃখদুর্দশা, বিভ্রান্তি, সুখ, হতাশা, বিপদ আপদ এবং আরও নানা প্রকার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের বিজড়িত হয়ে থাকতে দেখে। এইভাবে, তারা ঐ সকল অবস্থার মাঝেই চিন্তামগ্ন হয়ে থাকে, যদিও বাস্তব অর্থাৎ চিন্ময় তথা পারমার্থিক জগতে এই সব কিছুরই অস্তিত্ব নেই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই অবস্থান একই দেহের মধ্যে থাকে। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরম শক্তিমান পরমাত্মা যেহেতু সম্পূর্ণভাবেই সর্বজ্ঞ, তাই জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উপভোগে তিনি প্রবৃত্ত হন না, তবে নিতান্ত দর্শকরূপে সাক্ষী হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে অণুপরিমাণ বদ্ধজীব অজ্ঞতার ফলে তার নিজের কাজের পরিণামে কষ্টভোগ করতে থাকে। মুক্তজীব, তাঁর পূর্বকর্মের প্রারব্ধ ফলস্বরূপ একটি জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করে থাকলেও, সেই দেহের সুখ-দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। স্বপ্ন থেকে উত্থিত কোনও মানুষ যেভাবে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট অভিজ্ঞতাগুলিকে বিচার করে, সেইভাবেই মুক্তজীব জড়দেহের অভিজ্ঞতা-অনুভূতিগুলিকেও দেখতে থাকেন। অন্যদিকে, বদ্ধ জীব যদিও প্রকৃতই তার

শরীরের সুখ এবং দুঃখের ভোক্তা নয় তবুও স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতো সে কল্পনা করতে থাকে যেন তার স্বপ্নের মতো জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিও সত্য। ঠিক যেমন জলে প্রতিফলিত সূর্য বাস্তবিকই জলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় না, এবং বাতাস যেমন আকাশের কোনও বিশেষ অংশে আবদ্ধ হতে পারে না, তেমনই কোনও অনাসক্ত মানুষও জগৎ সম্পর্কে তারউদার দৃষ্টিভঙ্গীর কল্যাণে যুক্ত বৈরাগ্য তথা অনাসক্তির যথার্থ কুঠার দিয়ে তার সমস্ত সন্দেহ বিচ্ছিন্ন করবার সুযোগ কাজে লাগায়। যেহেতু তার জীবনিশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদির প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার কোনও প্রবণতা লাভ করেনি, তাই সে জড়দেহের মধ্যে অবস্থান করতে থাকলেও, মুক্ত সত্তা উপভোগ করতেই থাকে। সে বিপর্যস্ত হোক কিংবা আরাধিত হোক, ধীরস্থির হয়েই থাকে। এই জীবৎকালেই তাই তাকে মুক্ত পুরুষরূপে বিবেচনা করা হয়। এই জগতের পাপ এবং পুণ্য বিষয়ে কোনও কিছুই মুক্ত পুরুষের করণীয় থাকে না, তবে সমদৃষ্টিতেই সব কিছু লক্ষ্য করে থাকে। আত্মতৃপ্ত ঋষিতুল্য মানুষ কারও প্রশংসা কিংবা নিন্দা করে না। কারও সাথে সে অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করে না এবং জড়জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি সে তার মনোনিবেশও করে না। বরং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিন্তাতেই সে সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকে, তাই বুদ্ধিহীন মানুষের চোখে তাকে যেন নির্বাক উন্মাদগ্রস্ত মানুষ বলেই মনে হতে থাকে।

যদি কেউ বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার শিক্ষালাভ অথবা শিক্ষাপ্রদান করেও থাকেন, অথচ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সেবা নিবেদনের শুদ্ধ আকর্ষণ আয়ত্ত করতে পারেননি, তাহলে তিনি কেবল পণ্ডশ্রমই করেছেন। এমন শাস্ত্রাদি চর্চা করাই মানুষের উচিত, যাতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের গুণপ্রকৃতি, তাঁর অত্যাশ্চর্য লীলাবিলাস এবং তাঁর বিবিধ অবতারত্বের সুধাময় বিবরণী বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হয়েছে; তার ফলেই মানুষ সর্বোচ্চ সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। তাই, এইগুলি ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মানুষ নিতান্তই দুর্ভাগ্য আহরণ করে থাকে।

সম্পূর্ণ দৃঢ়মনস্ক হয়ে আত্মার পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করা উচিত এবং এই জড় দেহটির সাথে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি বর্জন করা প্রয়োজন। তারপরে সকল প্রেম ভালবাসার উৎস পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আপন হৃদয় সমর্পণ করা উচিত এবং তার ফলেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। যখন মন জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দ্বারা তাড়িত হতে থাকে, তখন অপ্রাকৃত চিন্ময় পরম তত্ত্বে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। বহু জন্মের মাঝে ধর্ম, অর্থ ও কাম

অনুশীলনের পরে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবশেষে শ্রবণ, কীর্তন ও নিত্য পরমেশ্বর ভগবানের পুণ্যপবিত্র লীলাবিলাস চিন্তনের অভ্যাস দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিশুদ্ধ করে ভগবদ্-বিশ্বাসী ঐকান্তিক ভক্তগণ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকেন। অবশেষে ঐ ধরনের সাধুগণ পারমার্থিক সদ্‌গুরু এবং সাধুজনোচিত ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভ করেন। তার পরে পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের করুণায়, তাঁরা পারমার্থিক জীবনের প্রামাণ্য পুরুষ তথা মহাজনদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তাঁদের আপন যথার্থ পরিচয় উপলব্ধির মাধ্যমে সার্থক জীবনে উন্নীত হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এই সকল উপদেশাবলী শ্রবণ করার পরে, উদ্ধব আরও অভিলাষ করলেন যাতে যথার্থ সাধুপুরুষের বৈশিষ্ট্যাদি উপলব্ধি করতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিবিধ প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন যে, যথার্থ সাধু অথবা বৈষ্ণবগণ নিম্নরূপ গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয়ে থাকেন। তিনি দয়ালু, দ্বেষহীন, সদা সত্যবাক, আত্মনিয়ন্ত্রিত, নির্ভুল, উদারমনা, নম্র, পরিচ্ছন্ন, অকৃপণ, সহৃদয়, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, কামবর্জিত, জড়জাগতিক আচরণবিমুখ, সুস্থির, মনের ষড়বিধ শত্রুর দমনে সক্ষম, মিতাহারী, অবিচল, শ্রদ্ধাবান, আত্মসম্মানে বিমুখ, মিষ্টভাষী, করুণাময়, মিত্রভাবাপন্ন, কাব্যরসিক, সুদক্ষ এবং মৌন হয়ে থাকেন। কোনও সাধুর মূল বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে ভরসা রাখেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় একাত্মভাবে নিয়োজিত থাকেন এবং তাঁকে অনন্তশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ে বিরাজিত অন্তর্যামী রূপে স্বীকার করেন, ভগবানকে যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে আরাধনা করেন, তিনিই সর্বোত্তম ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতির মধ্যে চৌষট্টি প্রকার কার্যকলাপ থাকে। সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১-৬) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের দর্শন, স্পর্শ, বন্দনা, সেবানিবেদন, গুণকীর্তন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন; (৭) ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকরাদি বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন; (৮) নিত্য ভগবৎ চিন্তন; (৯) স্বোপার্জিত সকল বস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন; (১০) আপনাকে ভগবানের দাস রূপে স্বীকার; (১১) ভগবানের আপন হৃদয় মন সমর্পণ; (১২) ভগবানের জন্ম ও লীলার গুণকীর্তন; (১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র তিথিগুলি উদ্‌যাপন; (১৪) ভগবানের মন্দিরে ভক্ত সংসর্গে উৎসবের মাধ্যমে নৃত্য, গীত, বাদ্য সহকারে উৎসব উদ্‌যাপন; (১৫) সকল প্রকার বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন; (১৬) ভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন; (১৭) বেদ ও তন্ত্রাদি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ; (১৮) ভগবানের উদ্দেশ্যে

প্রতিজ্ঞা পালন; (১৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ; (২০) এককভাবে কিংবা অন্যদের সঙ্গে একত্রভাবে শ্রীভগবানের সেবা অভিলাষে, সবজি ও ফুলের বাগান, মন্দির, নগর স্থাপন ইত্যাদি; (২১) বিনীতভাবে ভগবানের মন্দির মার্জন; এবং (২২) ভগবানের বাসভবন অলঙ্কৃত করে, মার্জন করে এবং শুভ মাঙ্গলিক চিহ্নে শোভিত করা।

তার পরে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচঃ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বদ্ধঃ**—বন্ধনের মধ্যে; **মুক্তঃ**—মুক্তি প্রাপ্ত; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যাখ্যা**—জীব সত্তার ব্যাখ্যা; **গুণতঃ**—জড়প্রকৃতির গুণাবলীর ফলে; **মে**—যা আমার শক্তি; **ন**—না; **বস্তুতঃ**—বাস্তবে; **গুণস্য**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর; **মায়া**—আমার মায়াবল; **মূলত্বাৎ**—কারণ স্বরূপ হওয়ার ফলে; **ন**—না; **মে**—আমার; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **ন**—না; **বন্ধনম্**—বন্ধনদশা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবে জীব কখনও বদ্ধ এবং কখনও মুক্ত অ্যাখ্যা পায়। বস্তুত, আত্মা কখনই বদ্ধ কিংবা মুক্ত হয় না, এবং জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর মূল কারণস্বরূপ মায়াশক্তির আমিই যেহেতু পরমেশ্বর, তাই আমাকেও কখনই মুক্ত কিংবা বদ্ধ বলে মনে করা চলে না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ ও মুক্ত জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি, সাধুপুরুষ নির্ণয়ের লক্ষণাদি, এবং ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের বিবিধ প্রক্রিয়াদি বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, ভগবানের কাছে উদ্ধব জানতে চেয়েছিলেন বদ্ধজীব ও মুক্ত পুরুষ হওয়া কিভাবে সম্ভব? ভগবান এখন উত্তর দিচ্ছেন যে, উদ্ধবের প্রশ্নটি কিছু পরিমাণে লঘু প্রকৃতির ভাবধারা থেকে উদ্ভূত, যেহেতু শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা কখনই ভগবানের জড়া শক্তির সাথে সংলগ্ন হয় না। জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সাথে জীব অলীক সংযোগ কল্পনা করার ফলে জড় দেহটিকেই আত্মসত্তা

রূপে ভ্রান্ত স্বীকার করে থাকে। এইভাবে জীব তার নিজের কল্পনায় তার পরিণামস্বরূপ কষ্টভোগ করে, ঠিক যেভাবে মানুষ স্বপ্নের মাঝে মায়াময় ক্রিয়াকলাপের ফলে কষ্টভোগ করতে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, জড় জগৎ মায়াময় যেন তার কোনই অস্তিত্ব নেই। জড়জগৎ অবশ্যই বাস্তব সত্য এবং পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রকাশ বলেই তা অবশ্যই প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু জীব যে নিজেকে জড় জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে, যার ফলে জড়জাগতিক বদ্ধ জীবনধারায় তাকে বিপরীতভাবের পরিবেশে আকৃষ্ট হতে হয়, তা মায়াময় ধারণা মাত্র। জীব কখনই বাস্তবিকই বদ্ধজীব নয়, যেহেতু জড়জগতের সঙ্গে শুধুমাত্র অলীক সংসর্গ কল্পনা করে, তাই সে ভ্রান্ত ধারণায় আবদ্ধ থাকে।

যেহেতু জীব এবং জড় বস্তুর মধ্যে বাস্তবিকই কোনও প্রকার সম্পর্ক নেই, তাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি বলতে কিছুই নেই। ভগবানের নিকৃষ্ট জড়াশক্তির চেয়ে জীবসত্তার নিত্য অপ্রাকৃত সত্তার মর্যাদা অনেক বেশি এবং সেই উন্নত জীবসত্তা বাস্তবিকই অনন্ত মুক্ত সত্তা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন যে, একভাবে বিবেচনা করলে জীব বাস্তবিকই আবদ্ধ নয় এবং মুক্ত হতেও পারে না। কিন্তু অন্যভাবে বিচার করা হলে, ভগবানেরই তটস্থা শক্তিস্বরূপ একক ব্যক্তিসত্তার আত্মার বিশেষ মর্যাদা বন্ধন এবং মুক্তি সংজ্ঞাগুলি দিয়ে বোঝাতে পারা সহজসাধ্য প্রয়াস হতে পারে না। যদিও জীবাত্মা কখনই জড়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবিকই বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, তা হলেও নিছক ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধির পরিণামে সে জড়া প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় কষ্টভোগ করতে থাকে। আর এই কারণেই *বদ্ধ* অর্থাৎ 'বন্ধনদশা প্রাপ্ত' এই সংজ্ঞাটি প্রয়োগের মাধ্যমে ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তির মাঝে জীবের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বোঝানো যেতে পারে। যেহেতু বদ্ধ বলতে একটি অনর্থক পরিস্থিতি বোঝায়, তাই সেই রকম পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথকেও *মোক্ষ* অর্থাৎ অব্যাহতির উপায় বলা যেতে পারে। সুতরাং বদ্ধ এবং *মুক্তি* সংজ্ঞাগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে, যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, ঐ ধরনের সংজ্ঞাগুলি শুধুমাত্র মায়ামোহ দ্বারা উদ্ভূত অস্থায়ী সাময়িক পরিস্থিতিকেই বোঝায় এবং জীবসত্তার যথার্থ প্রকৃতিকে নির্দেশ করে না। এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্*—*মোক্ষ* এবং *বন্ধন* সংজ্ঞাগুলি কখনই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, যেহেতু তিনি পরমতত্ত্ব এবং সবকিছুর পরম নিয়ন্তা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান পরম দিব্য সত্তা এবং তাঁকে মায়াবদ্ধ করা কখনই সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানের

মায়াশক্তির কর্তব্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভিন্ন আনন্দময় পরিস্থিতির মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে অজ্ঞানতার অভিমুখে জীবগণকে প্রলুব্ধ করে রাখা। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মর্যাদা থেকে ভিন্ন ভ্রমাত্মক অস্তিত্বের ধারণাকে বলা হয় *মায়া,* অর্থাৎ জাগতিক বিভ্রম। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়ার পরম অবিসম্বাদিত নিয়ন্তা, তাই মায়া পরমেশ্বর ভগবানের উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং *বন্ধনম্* অর্থাৎ 'বদ্ধতা' সংজ্ঞাটি সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। *মোক্ষ* অর্থাৎ 'মুক্তি' সংজ্ঞাটির মাধ্যমে বন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভের যে ভাবধারা অভিব্যক্ত হয়, সেটিও একইভাবে ভগবানের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য অভিব্যক্ত করেছেন। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বিপুল দিব্য শক্তি সম্পন্ন। তুচ্ছ কাল্পনিক ধারণার বশে, বদ্ধ জীব মনে করে যে, দিব্য আনন্দময় জীবনের উপভোগ করার জন্য যে বৈচিত্র্যময় দিব্য ক্ষমতারাশি থাকা প্রয়োজন, তা পরম তত্ত্বে অভাব আছে। যদিও জীব ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রকাশ, আপাতত তাকে হীনতর মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হয়েছে, এবং মানসিক কল্পনার মধ্যে চিন্তাশক্তির অপপ্রয়োগের ফলে তাকে বদ্ধজীবনধারার শৃঙ্খলিত হয়ে থাকতে হয়েছে। মুক্তি বা মোক্ষ লাভের অর্থ এই যে, জীবকে ভগবানের দিব্য শক্তির অধীনে আত্মস্থ হতে হবে, যে দিব্যশক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে—*হ্লাদিনী* অর্থাৎ আনন্দময় শক্তি; *সন্ধিনী* অর্থাৎ নিত্য সত্তার শক্তি; এবং *সম্বিৎ,* অর্থাৎ সর্বব্যাপকতার শক্তি। যেহেতু পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান নিত্যস্থিত সচ্চিদানন্দময় শক্তি, তাই তিনি কখনও বন্ধন কিংবা মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। জীব অবশ্য ভগবানের জড়জাগতিক শক্তির মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে বলে, কখনও বদ্ধ অবস্থায়, কখনও মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে পারে।

জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যরাশির নির্বিকার আদি সত্তাকে বলা হয় *মায়া*। যখন প্রকৃতির তিনটি গুণাবলী পরস্পর সম্পৃক্ত হতে থাকে, তখন সেইগুলির মধ্যে একটি গুণবৈশিষ্ট্য অন্যান্য দুটি গুণাবলীকে অধীনস্থ করে রাখতে সক্রিয় হয়ে থাকে, যাতে একটি গুণবৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য লাভ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই, ত্রিগুণরাশি সেইগুলির নিজ নিজ ভিন্ন রূপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে তিনটি গুণাবলীই স্বপ্রকাশিত করতে পারে। যদিও জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যসমন্বিত শক্তি পরমেশ্বর ভগবানেরই কাছ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে, তা হলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর স্বরূপে অভিব্যক্তির মাধ্যমেই সচ্চিদানন্দ নামে তিনটি চিন্ময় দিব্য শক্তিরও পরম আধার

রূপে নিত্য বিরাজমান থাকেন। যদি কেউ জড়াকাশে মায়ার রাজ্যে বদ্ধ জীবনের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী হয়, তবে চিদাকাশে যেখানে জীব সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করে থাকে এবং প্রেমময়ী ভগবৎ ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে আত্মনিয়োজিত হয়ে থাকতে পারে, সেই চিদ্‌জগতে অবশ্যই তাকে আসতে হবে। ভগবৎ প্রেমের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের উপযোগী নিত্য দিব্যরূপ লাভ করার মাধ্যমে, মানুষ অচিরে বদ্ধজীবন ও নির্বিশেষ মুক্তিলাভের পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নতি লাভ করে এবং তখন ভগবানের চিন্ময় শক্তির পরিচয় লাভের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তখন জড়জগতের মধ্যে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধির কোনই সম্ভাবনা আর থাকে না।

নিজেকে নিত্য চিন্ময় আত্মার স্বরূপে উপলব্ধি করার ফলে, জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কখনই সে জড় সত্তার সঙ্গে বাস্তবিকই সম্পৃক্ত নয়, কারণ ভগবানেরই উৎকৃষ্ট শক্তির অঙ্গরূপে তার সত্তা বিরাজমান রয়েছে। সুতরাং চিদাকাশের বাস্তবতার মধ্যে জড়জাগতিক বন্ধন এবং মুক্তি প্রকৃতপক্ষে উভয় বিষয়ই সম্পূর্ণ অর্থহীন বিষয়। জীবমাত্রই ভগবানের তটস্থা শক্তিস্বরূপ এবং সেই কারণেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে তার পূর্ণ অভিলাষ অনুসারে আত্মনিয়োগ করাই উচিত। নিত্য শাশ্বত চিন্ময় শরীর পুনরুদ্ধার হলে, জীব তখন নিজেকে ভগবানের দিব্য শক্তির একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাস্বরূপ আত্মোপলব্ধি করতে পারবে। অন্যভাবে বলা চলে যে, জীব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অনুকণাস্বরূপ এবং তাই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পরিবেশে অবস্থানের ফলে, তার পক্ষে জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মায়াস্রোতে ভেসে যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, জীবসত্তা কখনই জড়সত্তার মাঝে বাস্তবিকই বিজড়িত হয় না এবং তাই মুক্ত হওয়ায় প্রশ্ন ওঠে যদিও তার মায়াবদ্ধ অবস্থাটিকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে গেলে বলতে হয় যে, সে মায়াজালে আবদ্ধ এবং মুক্ত। অপরদিকে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন দিব্য শক্তিরাজির মাঝে নিত্য বিরাজ করে আছেন এবং তাঁকে কখনই বন্ধনদশা প্রাপ্ত বলা চলে না, এবং তাই সেই ধরনের অলীক পরিস্থিতি থেকে ভগবান নিজে মুক্ত করবেন, এমন কোনও তত্ত্বেরই অর্থ হয় না।

শ্লোক ২

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া ।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥ ২ ॥

শোক—শোক দুঃখ; **মোহৌ**—এবং মায়ামোহ; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখদুর্দশা; **দেহ-আপত্তিঃ**—জড় দেহ ধারণ; **চ**—ও; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন;

যথা—যেমন; **আত্মনঃ**—বুদ্ধির; **খ্যাতিঃ**—নিতান্ত এক ধারণামাত্র; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্ব; **ন**—না; **তু**—অবশ্য; **বাস্তবী**—বাস্তব সত্য।

অনুবাদ

স্বপ্ন যেমন মানুষের নিতান্ত বুদ্ধি প্রসূত সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে তার কোনই সত্যতা নেই, তেমনই, জড়জাগতিক শোকদুঃখ, মায়ামোহ, সুখ, বিষাদ এবং মায়ার অধীনে জড়দেহ ধারণও সবই আমার মায়াশক্তিরই সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা চলে, মায়াময় অস্তিত্বের কোনই বাস্তব উপযোগিতা নেই।

তাৎপর্য

দেহ-আপত্তিঃ শব্দটি বোঝায় যে, জীবমাত্রই মিথ্যা ভাবনায় নিজেকে তার বহিরঙ্গা জড় দেহটির সাথে একাত্মবোধ করে এবং সেই ভাবেই একটি দেহ থেকে অন্যত্র দেহান্তরিত হতেই থাকে। *আপত্তি* শব্দটি আরও বোঝায় যে, বিষম বিপত্তি অর্থাৎ দুর্ভাগ্য এই দেহ সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। মায়ার প্রভাবে এহ ধরনের মিথ্যা ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, এখানে বর্ণিত ভয়াবহ লক্ষণাদি জীবমাত্রই ভোগ করতে থাকে। *মায়া* বলতে বোঝায় একটি মিথ্যা ভাবধারা যার দ্বারা বোঝানো হয় যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধন ব্যতিরেকেই অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান ছাড়াই কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। যদিও বদ্ধজীবগণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টা করেই চলেছে, তবে তার পরিণামও সর্বদা বেদনাদায়ক হয়, এবং সেই ধরনের কষ্টকর অভিজ্ঞতাদির ফলেই জীবাত্মা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াসী হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, জড়জাগতিক সৃষ্টি রহস্যের পরম উদ্দেশ্যই হল ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যে জীবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং, জড়জগতের সকল দুঃখকষ্টগুলিকেও পরমেশ্বর ভগবানেরই দিব্য কৃপাস্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে। বদ্ধ জীবাত্মা যেহেতু মনে করে যে, জড়জাগতিক সবকিছুই তারই নিজেকে ভোগ উপভোগের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, তাই সে ঐ সকল বস্তু হারিয়ে ফেলার সব ঘটনাতেই তীব্র দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। এই শ্লোকটিতে একটি স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে জড়জাগতিক বুদ্ধির ফলে বহু মায়াময় বিষয়াদির সৃষ্টি হতে থাকে। তেমনই, আমাদের কলুষময় জড়জাগতিক চেতনার মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের ভিত্তিহীন ধারণা সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই কল্পনাট্যরূপ যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃতশূন্য বিষয়াদি নিয়ে রচিত হয়, তাই বাস্তবিকই তার কোনই অস্তিত্ব থাকে না। কলুষময় জড়জাগতিক অনুভূতি-চেতনার মাঝে আত্মসংযোজনের ফলে, জীব নানাপ্রকার বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই পরিস্থিতির

একমাত্র সমাধান স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সব কিছুর মধ্যে উপস্থিত আছে, এবং সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে হয়। এইভাবেই মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরম ভোক্তা, সবকিছুরই মালিক, এবং সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ।

জড়জাগতিক মায়ামোহের ফলে, জীব নিজের নিত্য চিন্ময় শরীরের কোনও উপলব্ধি করতে পারে না, কিংবা পরমতত্ত্ব সম্পর্কেও তার কোনই ধারণা নেই। তার ফলে, জড়জাগতিক অস্তিত্ব, তা যতই অতি চাকচিক্যময় কিংবা পুণ্য পবিত্র রূপধারী হোক, তার মধ্যে আত্মস্থ হওয়া সর্বদাই মূর্খতা মাত্র। স্বপ্নদর্শনের দৃষ্টান্তটি থেকে ভ্রান্ত ধারণা করা উচিত নয় যে, জড়জগতের বুঝি কোনই অস্তিত্ব নেই। চিন্ময় আকাশ যেমন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। তেমনই জড়াপ্রকৃতিও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। যদিও জড়জাগতিক বস্তুসামগ্রী পরিবর্তনশীল এবং তাই সেগুলির কোনই স্থায়ী অস্তিত্ব থাকে না, তা হলেও জড়শক্তি বাস্তব সত্য যেহেতু পরম তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব থেকেই তার উদ্ভব হয়ে থাকে। জড় দেহটিকে আমাদের বৃথাই স্বীকার করার ফলে আমাদের যথার্থ আত্মজ্ঞান করে থাকি এবং আমরা নির্বোধের মতো স্বপ্ন দেখে থাকি যেন জড়জগতটি আমাদের সুখভোগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই সুখস্বপ্নের কোনই বাস্তব সত্যতা নেই। সেগুলি সবই নিতান্ত মানসিক কল্পনা মাত্র। তাই মানুষকে তার জড়জাগতিক দেহাত্ম পরিচয়গুলির ধারণা থেকে মন পরিষ্কার করে তুলতে হবে এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপী বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

শ্লোক ৩

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্ ।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥ ৩ ॥

বিদ্যা—জ্ঞান; **অবিদ্যে**—এবং অজ্ঞানতা; **মম**—আমার; **তনূ**—অভিব্যক্ত শক্তিরাজি; **বিদ্ধি**—উপলব্ধি কর; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **শরীরিণাম্**—শরীরধারী জীবগণ; **মোক্ষ**—মুক্তি; **বন্ধ**—বন্ধন; **করী**—কারণ; **আদ্যে**—আদি, নিত্য; **মায়য়া**—শক্তিবলে; **মে**—আমার; **বিনির্মিতে**—নির্মিত হয়।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই মায়ার সৃষ্টি, তা আমারই শক্তির অভিপ্রকাশ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই অনাদি অনন্ত স্বরূপ এবং দেহধারী জীবগণকে তা নিত্যকাল মুক্তি এবং বন্ধন দশা ভোগ করায়।

তাৎপর্য

বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে, বদ্ধ জীব মায়ার কবল থেকে মুক্তিলাভ করে, এবং তেমনই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতার প্রসার হলে বদ্ধ জীবাত্মা ক্রমশ আরও বেশি পরিমাণে মায়ামোহ এবং বন্ধনদশা ভোগ করতে থাকে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়ই পরমেশ্বর ভগবানের বিপুল শক্তির উৎপত্তি। জীব যখনই নিজেকে সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় দেহগুলির অধিকর্তা মনে করে, তখনই মায়ামোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, জীবকে *জীবমায়া* রূপে অভিহিত করা যেতে পারে, তেমনই জড় পদার্থগুলিকে *গুণমায়া* বলা হয়ে থাকে। জীব তার জীবন-শক্তিকে (*জীবমায়া*) তুচ্ছ গুণবৈচিত্র্যের (*গুণমায়া*) মাঝে আবদ্ধ রাখার ফলে বৃথাই স্বপ্নচিন্তা করতে থাকে যেন সে এই জড়জগতের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। সেই ধরনের কৃত্রিম ভাবমিশ্রণকে বলা হয় মায়ামোহ কিংবা অজ্ঞানতা। যখনই ভগবানের সকল প্রকার শক্তি বৈচিত্র্যের যথার্থ ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়, তখনই মাত্র জীব জড়জাগতিক বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয় এবং চিদাকাশে তার সচ্চিদানন্দময় নিজধামে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর শক্তিরাজি থেকে ভিন্ন নন, তা সত্ত্বেও তিনি সেই সকল শক্তি সম্পদেরও ঊর্ধ্বে সেগুলির পরম নিয়ন্তারূপেই বিরাজিত রয়েছেন। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে মুক্ত রূপেই অভিহিত করা যেতে পারে, যার ফলে বোঝানো যায় যে, তিনি নিত্যকালই জড়জাগতিক কলুষতা মুক্ত এবং জড়জাগতিক পরিবেশের মাঝে বাস্তবিক সর্ব প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকে তিনি মুক্ত। শ্রীল মধ্বাচার্যের অভিমত অনুসারে, *বিদ্যা* শব্দটি লক্ষ্মী দেবীকে বোঝায়, যিনি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ, আর *অবিদ্যা* বলতে দুর্গাদেবীকে বোঝায়, অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। পরিণামে অবশ্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আপনার অভিলাষ অনুসারে তাঁর শক্তিরাজির রূপান্তর সৃষ্টি করতে পারেন, যে বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/৩/৩৪) তাৎপর্যভাষ্যে ব্যাখ্যা করেছেন, যেহেতু ভগবান দিব্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব, সেই কারণে তাঁর রূপ, নাম, লীলা, পরিকর, পারিষদবর্গ এবং শক্তিরাশিও তাঁর সাথে অভিন্ন। তাঁর দিব্য শক্তিরাশি তাঁরই সর্বময় শক্তিমত্তা অনুসারে সক্রিয় হয়ে থাকে। একই শক্তিপুঞ্জ তাঁর বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিসম্পদ রূপে সক্রিয় হয়ে থাকে, এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার সাহায্যে তাঁর উপরোক্ত যে কোনও শক্তির মাধ্যমে সবকিছু এবং যা কিছু সম্ভব তিনি সাধন করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছামতো তিনি বহিরঙ্গা শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে সক্রিয় করে তুলতেও পারেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য রেখেছেন যে, যদিও এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে ভগবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, জীব কখনই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ নয়, এবং তাই বাস্তবিকই তাকে কখনই মুক্ত হতেও হয় না, তা হলেও মানুষ *বন্ধন* এবং *মুক্তি* সম্পর্কিত ভাবধারা প্রয়োগ করতে পারে, যদি মনে করে যে, জীবমাত্রই পরমেশ্বর ভগবানেরই নিত্য দিব্য অংশ মাত্র। তা ছাড়া *মায়য়া মে বিনির্মিতে* শব্দগুলিরও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা অনুচিত হবে—এর দ্বারা জড়জাগতিক বন্ধন মুক্তিকে অনিত্য সংজ্ঞা বলা হয়েছে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং *আদ্যে* শব্দটি, যার অর্থ 'প্রাচীন ও নিত্য' সেটি এই শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবানের *বিদ্যা* ও *অবিদ্যা* শক্তির কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে, কারণ মায়ার মাধ্যমেই বিদ্যা ও অবিদ্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইগুলিও ভগবানের শক্তিরাজির অন্যতম এবং সেইগুলির মাধ্যমে ভগবানের শক্তি অভিপ্রকাশ ঘটে। *বিদ্যা* শক্তি স্ফুরিত হলে জীব ভগবানের লীলাকাহিনীর মাধ্যমে ভগবানের কার্যাবলীর কারণ উপলব্ধি করে। *অবিদ্যা* শক্তি থেকে জীবের মনে বিস্মৃতি জাগে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে গিয়ে সে অন্ধকার তমোজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়ই ভগবানেরই তটস্থা শক্তির নিত্যগ্রাহ্য প্রতিভাস মাত্র, এবং এই ভাবধারা অনুসারে মন্তব্য করা অন্যায় হবে না যে, জীব মাত্রই নিত্যবদ্ধ কিংবা নিত্য মুক্ত উভয় মর্যাদাই লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে *বিনির্মিতে*, অর্থাৎ 'নির্মিত হয়' পদটি বোঝায় যে, ভগবান তাঁর আপন শক্তির বিস্তারের মাধ্যমে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার উদ্ভব করে থাকেন, যার মাধ্যমেই ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিরাজির ক্রিয়াকলাপ অভিব্যক্ত হতে থাকে। সেই ধরনের শক্তিসম্পন্ন অভিপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হতে পারে, কিন্তু জড়জাগতিক বদ্ধদশা এবং পারমার্থিক মুক্তিলাভ ভোগ করার নিত্যকালের অভিরুচি ভগবানের তটস্থা শক্তিরই আপন বৈশিষ্ট্য, তা অনস্বীকার্য বটে।

শ্লোক ৪

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে ।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ৪ ॥

একস্য—একের; **এব**—অবশ্যই; **মম**—আমার; **অংশস্য**—অবিচ্ছেদ্য অংশ; **জীবস্য**—জীবের; **এব**—অবশ্যই; **মহা-মতে**—হে মহাবুদ্ধিমান; **বন্ধঃ**—বন্ধনদশা; **অস্য**—তার; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানতার ফলে; **অনাদিঃ**—আদিহীন; **বিদ্যয়া**—জ্ঞানের মাধ্যমে; **চ**—এবং; **তথা**—সেইভাবে; **ইতরঃ**—বিপরীতরূপের বন্ধন, মুক্তি।

অনুবাদ

হে মহাবুদ্ধিমান উদ্ধব, জীব আমারই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, কিন্তু অজ্ঞানতার প্রভাবে তাকে অনাদিকাল যাবৎ জড়জাগতিক বন্ধনদশার কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। অবশ্য জ্ঞানের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

যেভাবে সূর্য তার আপন রশ্মির মাধ্যমে নিজেকে উদ্ভাসিত করে কিংবা মেঘ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে আবৃত করে থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর আপন শক্তির অভিপ্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতায় আপনাকে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রাখেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগতকে ধারণ করে আছে।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সব জীব ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কারণ গুণগতভাবে তার অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই জীব কখনই শক্তিসামর্থ্যে ভগবানের সমকক্ষ নয়।"

শক্তিসামর্থ্যের গুণগত হীনতার ফলেই, জীবমাত্রই মায়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং ভগবানের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করতে পারলেই আবার সেই মায়াবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। *অংশ* অর্থাৎ 'অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ' ভাবধারাটিও *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) উল্লেখ করা হয়েছে—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*। জীবমাত্রই ভগবানের অংশ, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা অণুকণা মাত্র, এবং সেই কারণেই মুক্তি ও বন্ধনদশার অধীন হয়েই সেই অংশটিকে থাকতে হয়। তাই *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর উৎকৃষ্টা শক্তির সাথে ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিরও অধিকারী। এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিও চিন্ময় দিব্য শক্তি, কিন্তু এই শক্তি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৃতীয় অর্থাৎ জড়জাগতিক শক্তিরূপে অজ্ঞানতা অথবা তমোগুণের দ্বারাও

আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আচ্ছাদনের ফলে, দ্বিতীয় অর্থাৎ তটস্থা শক্তি বিভিন্ন প্রকার বিবর্তনের ধারায় অভিব্যক্ত হতে থাকে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকেই সকাম কর্ম সম্পাদনের অভ্যাসে জীবমাত্রই আত্মনিয়োজিত রয়েছে। এই কারণেই তার বদ্ধজীবনধারাকে অনাদি বদ্ধ জীবন বলা চলতে পারে। এই ধরনের বদ্ধ জীবন অবশ্য অনন্তকালের জন্য নয়, কারণ প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। যেহেতু জীবের মুক্তিলাভ করা সম্ভব হতে পারে, তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জীবের মুক্ত জীবনধারা কোনও এক সময়ে শুরু হলেও তা অনন্তকাল প্রবহমান থাকে, যেহেতু মুক্ত জীবন অনন্ত সত্তাসম্পন্ন বলেই স্বীকার করা হয়। যেভাবেই হোক, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ যে করতে পেরেছে, তাকে নিত্যমুক্ত বলে স্বীকার করা যেতে পারে, যেহেতু সেই ধরনের মানুষ চিদাকাশের দিব্য অনন্ত পরিবেশে চিরকালের মতো প্রবেশলাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে। যেহেতু চিদাকাশে কোনও জড়জাগতিক কালের প্রভাব নেই, সেই কারণেই জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন গ্রহলোকে গিয়েই তার নিত্য চিন্ময় দিব্য শরীর লাভ করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার সচ্চিদানন্দময় জীবনধারা জড়জাগতিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মফলের বিচারে নির্ধারিত হয় না এবং তাই সেই জীবনধারাটিকে বলা হয় নিত্য মুক্তি। চিদাকাশে জড়জাগতিক কালের হিসাব স্পষ্টতই অনুপস্থিত, এবং প্রত্যেক জীবই সেখানে পরম সত্তা অর্জন করার ফলে নিত্যমুক্ত হয়ে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* যেভাবে ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও ভগবান সম্পর্কিত তিনটি স্তরের মাধ্যমে *বিদ্যা* অর্থাৎ যথার্থ সার্থক জ্ঞানের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, তা চর্চার ফলেই মুক্তি অর্জন করা যেতে পারে। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের পরম পর্যায় বলতে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই ধরনের জ্ঞানকে *রাজবিদ্যা*, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের রাজা বলা হয়েছে, আর এই বিদ্যাই পরম মুক্তি প্রদান করে থাকে।

শ্লোক ৫

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে ।
বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্মিণি ॥ ৫ ॥

অথ—এইভাবে; **বদ্ধস্য**—বদ্ধ জীবাত্মার; **মুক্তস্য**—পরমমুক্ত ভগবানের; **বৈলক্ষণ্যম্**—বিভিন্ন লক্ষণাদি; **বদামি**—আমি এখন বলছি; **তে**—তোমাকে;

বিরুদ্ধ—বিপরীতধর্মী; **ধর্মিণোঃ**—যার দুটি প্রকৃতি; **তাত**—হে উদ্ধব; **স্থিতয়োঃ**—যে দুজন অবস্থিত; **এক ধর্মিণি**—তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি প্রকাশমান একটি শরীর।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, এইভাবেই একই জড়দেহের মধ্যে আমরা বিপুল সুখ এবং দুঃখ দুর্দশার মতো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি। তার কারণ এই যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যিনি নিত্যমুক্ত দিব্য সত্তা, আর সেই সঙ্গে বদ্ধ জীবাত্মা উভয়েই দেহের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি তোমার কাছে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদির কথা বলব।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকটিতে, উদ্ধব মুক্ত এবং বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন লক্ষণাদি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, বদ্ধাবস্থা এবং মুক্তাবস্থার বৈশিষ্ট্যাদি দুটি বিভাগে উপলব্ধি করা চলে—সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মা ও নিত্যমুক্ত পরমাত্মা স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য অথবা জীব সত্তার পর্যায়ে বদ্ধ জীবাত্মা ও মুক্তাত্মার মধ্যে পার্থক্য। ভগবান প্রথমে সাধারণ বদ্ধ জীবসত্তা ও পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করবেন, যা থেকে নিয়ন্ত্রিত সত্তা ও পরম নিয়ন্তার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা যেতে পারবে।

শ্লোক ৬

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নম্
অন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৬ ॥

সুপর্ণৌ—দুটি পাখি; **এতৌ**—এই; **সদৃশৌ**—একই রকম; **সখায়ৌ**—বন্ধুগণ; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **এতৌ**—এই দুই; **কৃত**—তৈরি; **নীড়ৌ**—একটি বাসা; **চ**—এবং; **বৃক্ষে**—একটি গাছে; **একঃ**—এক; **তয়োঃ**—দুইজনের; **খাদতি**—খাচ্ছিল; **পিপ্পল**—গাছটির; **অন্নম্**—ফলগুলির; **অন্যঃ**—অপরটি; **নিরন্নঃ**—না খেয়ে; **অপি**—যদিও; **বলেন**—শক্তির দ্বারা; **ভূয়ান্**—তিনিই শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

ঘটনাক্রমে দুটি পাখি একই গাছে একসঙ্গে বাসা করেছে। দুটি পাখিই বন্ধু আর সমপ্রকৃতি। অবশ্য, তাদের মধ্যে একজন গাছটির ফল খাচ্ছে, অন্যদিকে অন্য পাখিটি যে ফল খাচ্ছে না, সে নিজ শক্তির ফলে উত্তম মর্যাদায় অবস্থান করছে।

তাৎপর্য

জড় দেহের হৃদয়ের মাঝে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তথা পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান এখানে একই গাছে দুটি পাখির অবস্থানের সঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। পাখি যেমন গাছে বাসা বাঁধে, তেমনই জীব হৃদয়ে অবস্থান করে থাকে। দৃষ্টান্তটি যথাযথ হয়েছে, কারণ পাখি সর্বদাই গাছটি থেকে ভিন্ন সত্তারূপে বিরাজ করে। তেমনই, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন, উভয়েই অস্থায়ী জড় শরীর থেকে ভিন্ন। *বলেন* শব্দটি বোঝায় যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েই থাকেন। *ভূয়ান্*, অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বসম্পন্ন" শব্দের মাধ্যমে বোঝায় যে, পরমেশ্বর ভগবান নিত্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন, সেক্ষেত্রে জীব কখনও মায়ামোহগ্রস্ত এবং কখনও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়। *বলেন* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান কখনই তমোগুণাচ্ছন্ন কিংবা অজ্ঞানতার অন্ধকারে বিরাজ করেন না, তবে তিনি নিত্য সচ্চিদানন্দময় সত্তায় অবস্থিত থাকেন।

তাই, ভগবান *নিরন্ন*, অর্থাৎ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের তিক্ত ফল আস্বাদনে অনাসক্ত হয়ে থাকেন, অথচ সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মা সেই ধরনের তিক্ত ফলগুলিকেই মিষ্ট মনে করে তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করতে থাকে। অবশেষে সকল জড়জাগতিক কর্মপ্রচেষ্টার পরিণামেই আছে মৃত্যু, কিন্তু জীব নির্বোধের মতো মনে করে জড় বিষয়াদি থেকে সে আনন্দসুখ অর্পণ করবে। *সখায়ৌ* অর্থাৎ "দুই সখা" শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের যথার্থ সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অন্তরে বিরাজমান রয়েছেন। কেবলমাত্র তিনিই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বোঝেন, এবং একমাত্র তিনিই আমাদের যথার্থ সুখ প্রদান করতে পারেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, তিনি ধৈর্য সহকারে অন্তরে বিরাজমান থেকে, বদ্ধ জীবাত্মাকে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করতে থাকেন। অবশ্য কোনও জড়জাগতিক বন্ধুই তার কোনও বুদ্ধিহীন সঙ্গীর সাথে লক্ষ লক্ষ বছর যাবৎ থাকতে চায় না, বিশেষ করে, যদি তার সঙ্গী তাকে অবহেলা কিংবা অভিসম্পাত করতেও থাকে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই বিশ্বস্ত প্রেমময় সখা যে, অতি দানবীয় জীবের সঙ্গেও তিনি থাকেন এবং তিনি কীটপতঙ্গ, শূয়োর ও কুকুরের অন্তরেও থাকেন। তার কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ এবং তিনি প্রত্যেক জীবকেই তাঁর নিজের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে বিবেচনা করে থাকেন। প্রত্যেক জীবেরই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষস্বরূপ কর্মকাণ্ডের তিক্ত ফলরাশি বর্জন করাই উচিত। অন্তরের মাঝে ভগবানের উদ্দেশ্যেই মানুষের দৃষ্টি ফেরানো উচিত এবং জীবের যথার্থ সখা পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিত্য প্রেমময় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে আপন অন্তরমাঝে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। *সদৃশৌ* অর্থাৎ 'সমান প্রকৃতিসম্পন্ন' শব্দটি বোঝায় যে, জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই পরম চেতন। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশস্বরূপ আমরাও ভগবানের প্রকৃতির অংশীদার, কিন্তু তা অতি কণামাত্র পরিমাণে। তাই ভগবান এবং জীবসত্তা *সদৃশৌ।* অনুরূপ বর্ণনা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* (৪/৬) দেখা যায়—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলাং স্বাদ্বত্ত্য
অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি ॥

"একটি গাছে দুটি পাখি আছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি গাছের ফলগুলি খাচ্ছে, আর অন্যটি সেই কাজ লক্ষ্য করছে। লক্ষ্যকারী ভগবান এবং ফল ভক্ষণকারী জীবসত্তা।"

শ্লোক ৭

আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বান্
অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **অন্যম্**—অন্যজন; **চ**—আরও; **সঃ**—তিনি; **বেদ**—জানে; **বিদ্বান্**—জ্ঞানময়; **অপিপ্পল-অদঃ**—গাছের ফল ভক্ষণ করছে না; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **পিপ্পল-অদঃ**—গাছটির ফল যে ভক্ষণ করছে; **যঃ**—যে; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানতার সঙ্গে; **যুক্**—পূর্ণ; **সঃ**—সে; **তু**—অবশ্য; **নিত্য**—নিত্যকাল; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ; **বিদ্যা-ময়ঃ**—যথার্থ জ্ঞানে পরিপূর্ণ; **যঃ**—যে; **সঃ**—সে; **তু**—অবশ্য; **নিত্য**—নিত্যকাল **মুক্ত**—মুক্ত।

অনুবাদ

যে পাখিটি গাছটির ফল ভক্ষণ করে না, সেটি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি তাঁর সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর আপন মর্যাদা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং ফল ভক্ষণকারী পাখিটির মতো বদ্ধজীবের সত্তাও উপলব্ধি করেন। অপর দিকে ঐ জীব নিজেকে উপলব্ধি করে না কিংবা ভগবানকেও অনুভব করে না। সে

অজ্ঞানতার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এবং তাই তাকে নিত্য বদ্ধ বলা হয়ে থাকে, আর পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন বলেই তিনি নিত্য মুক্ত পুরুষ রূপে বিরাজমান থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির মধ্যে *বিদ্যাময়* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং তা বহিরঙ্গা শক্তি তথা মহামায়া থেকে উচ্চস্তরের ভগবৎ গুণ। জড় জগতের বিদ্যা অর্থাৎ জড়জাগতিক বিজ্ঞানতত্ত্ব এবং অবিদ্যা অর্থাৎ জড়জাগতিক অজ্ঞানতা রয়েছে, তবে এই শ্লোকে বিদ্যা বলতে অন্তরঙ্গা পারমার্থিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যে জ্ঞানের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবান পরম তত্ত্বজ্ঞানের মাঝে আপনাকে চির বিরাজিত রাখেন। বহু বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে একটি গাছে দুটি পাখির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা বোঝানো হয় যে, *নিত্যোনিত্যানাম্* অর্থাৎ নিত্যস্থিত সত্তা দুটি আছে—পরমেশ্বর ভগবান এবং অণুসদৃশ জীবাত্মা। বদ্ধ জীবাত্মা ভগবানের নিত্য দাস রূপে আপন সত্তা বিস্মৃত হওয়ার ফলে তার নিজের কাজকর্মের ফল উপভোগ করতে চায় এবং তার ফলে অজ্ঞানতার ধারায় প্রবহমান হয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই অজ্ঞানতার বদ্ধদশা বর্তমান রয়েছে এবং চিন্ময় জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রেমময়ী ভগবৎ সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে তার প্রতিকার করা সম্ভব হতে পারে। বদ্ধ জীবনধারায় জীবকে প্রকৃতির বিধিনিয়মাদি অনুসারে জীবকে পুণ্য ধর্মী এবং পাপধর্মী ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে বাধ্য হয়ে নিয়োজিত থাকতে হয়, তবে প্রত্যেক জীবের মুক্ত সত্তার অর্থ এই যে, তার সকল কর্মের ফলশ্রুতি পরম ভোক্তা ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। তাই বোঝা উচিত যে, জীব যদিও কখনও মুক্ত সত্তায় বিরাজমান হতেও পারে, তবুও তার জ্ঞানসম্পদ কখনই পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এমন কি পরম জীবসত্তা ব্রহ্মাও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৫) বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজবিদ্যা তথা শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পদ অর্জুনকে প্রদান করেছেন—

বহূনি মে ব্যতিতানি জন্মানি তব চার্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পারো না।"

বদ্ধ অর্থাৎ 'আবদ্ধ' শব্দটির দ্বারাও বুঝতে হবে যে, তার দ্বারা ভগবানের উপরেই জীবের নির্ভরতা স্বীকার করা হয়েছে—কখনও বদ্ধ অবস্থায় কিংবা কখনও মুক্ত অবস্থায়। মায়ার রাজ্যে জীব তার জন্ম মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিয়মে বদ্ধ হয়ে থাকে, অথচ চিন্ময় আকাশে জীব ভগবানের সাথে প্রেমময়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। মুক্তি বলতে জীবনের সকল দুর্দশা থেকে অব্যাহতি বোঝায়, কিন্তু তার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে প্রেমময় সম্পর্কের বিচ্যুতি কখনই বোঝায় না। শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে, ভগবান একমাত্র মুক্ত জীবসত্তা এবং অন্য সকল জীবই নিত্য নির্ভরশীল এবং ভগবানের সাথে চির আবদ্ধ সত্তা, সেই বন্ধন কখনও আনন্দময় সেবার সম্পর্কে কখনও বা মায়া বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করে থাকে। জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষের তিক্ত ফল আস্বাদন করা বদ্ধ জীবের পক্ষে অনুচিত এবং তার পরিবর্তে তার পরম সুহৃৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তার মনোনিবেশ করা উচিত। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার হৃদয়মাঝেই অবস্থান করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন করার মতো আনন্দের কাজ আর কিছুই হতে পারে না, কারণ তার ফলেই মুক্ত জীব সুখসাগরে প্রবেশ করে থাকে।

শ্লোক ৮

দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥ ৮ ॥

দেহ—জড় দেহের মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **দেহ**—শরীরে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান ব্যক্তি; **স্বপ্নাৎ**—স্বপ্ন থেকে; **যথা**—যেমন; **উত্থিতঃ**—জেগে ওঠা; **অদেহ**—শরীরের মধ্যে নয়; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **দেহ**—দেহের মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **কুমতিঃ**—দুর্বুদ্ধি মানুষ; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **দৃক্**—দেখে; **যথা**—যেভাবে।

অনুবাদ

জড় দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেও, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেহের বাইরেও নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক যেমন স্বপ্ন থেকে উত্থিত মানুষ স্বপ্নে দেখা শরীরের সাথে আত্মস্থ হয়ে থাকা বর্জন করতে পারে। অবশ্য, নির্বোধ মানুষ তার জড় দেহটির সাথে একাত্ম না হলেও, তা থেকে অতীত সত্তা হওয়া সত্ত্বেও, মনে করে সে শরীরটির মধ্যেই রয়েছে, ঠিক যেমন স্বপ্নমগ্ন মানুষ নিজেকেই একটা কাল্পনিক শরীরের মধ্যে দেখতে পায়।

তাৎপর্য

মুক্তাত্মা পুরুষ ও বদ্ধ জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলোচনার মধ্যে, ভগবান প্রথমেই নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর ভগবান এবং তটস্থা শক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে, অগণিত জীবগণ যারা কখনও বদ্ধ জীব এবং কখনও মুক্তাত্মা, তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী নয়টি শ্লোকে, ভগবান মুক্ত ও বদ্ধ জীবাত্মার বিভিন্ন লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ নিজেকে কোনও এক কাল্পনিক দেহে লক্ষ্য করে থাকে, তবে জেগে ওঠার পরে সেই দেহটির সাথে দেহাত্মবোধ বর্জন করে। তেমনই, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে নবজাগরণ যার হয়েছে, সে আর স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জড় শরীরাদির সাথে দেহাত্মবোধ পোষণ করে না কিংবা জড়জাগতিক জীবনধারার সুখ ও দুঃখের দ্বারও সে আর বিচলিত হয় না। অন্যদিকে, মূর্খ মানুষ (কুমতিসম্পন্ন) কখনও জড়জাগতিক অস্তিত্বের স্বপ্ন থেকে জাগরিত হয় না এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাদির সঙ্গে মিথ্যা দেহাত্মবোধের পরিণামে অগণিত সমস্যাদির মধ্যে বিজড়িত হয়ে পড়ে। নিজের চিরন্তন চিন্ময় পরিচয় (নিত্যস্বরূপ) উপলব্ধির মাধ্যমে সেই মর্যাদায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করা চাই। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে যথাযথভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারলে, মানুষ তার মিথ্যা জড়জাগতিক আত্মপরিচয়ের মোহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, এবং তার ফলে মায়াময় অস্তিত্বের দুঃখকষ্ট অচিরে দূর হয়ে যায়, ঠিক যেমন দুঃস্বপ্ন থেকে মনোরম পরিবেশের মধ্যে জেগে ওঠা মাত্রই সেই স্বপ্নের যতকিছু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তবে বোঝা উচিত যে, স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার উপমাটি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, যেহেতু তিনি কখনই মায়ামোহগ্রস্ত হন না। ভগবান বিষ্ণুতত্ত্ব নামে তাঁর আপন অনুপম অংশে নিত্য জাগরিত এবং জ্ঞানোদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন। যিনি বিদ্বান, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন, তাঁর কাছে এই তত্ত্ব নিতান্তই সহজবোধ্য বিষয়।

শ্লোক ৯

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপিগুণেষু চ ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়গুলির; **অর্থেষু**—বিষয়াদিতে; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে উদ্ভূত; **অপি**—সত্ত্বেও; **গুণেষু**—একই গুণাবলীর দ্বারা উদ্ভূত; **চ**—ও; **গৃহ্যমাণেষু**—যেভাবে সেইগুলি গৃহীত হয়ে থাকে; **অহম্**—

অহমিকা; কুর্যাৎ—সৃষ্টি করবে; ন—না; বিদ্বান্—বিদ্বান ব্যক্তি; যঃ—যে; তু—অবশ্য; অবিক্রিয়ঃ—জড়জাগতিক বাসনার দ্বারা অবিচলিত।

অনুবাদ

জড়জাগতিক বাসনার কলুষতা থেকে মুক্ত যে কোনও বিদ্বান ব্যক্তি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কর্মীরূপে নিজেকে মনে করেন না; বরং সে জানে যে, ঐ ধরনের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই শুধুমাত্র জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী থেকে উদ্ভূত ইন্দ্রিয়গুলিই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধন করছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৮) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥

"হে মহাবাহো, ভগবদ্ভক্তিবিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের মধ্যে পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হন না।"

জড়জাগতিক দেহটি সদাসর্বদাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে থাকে, কারণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই দেহটিকে অবশ্যই আহার, নিদ্রা, পান ও বাচন ইত্যাদি করে চলতে হয়, কিন্তু জ্ঞানবান মানুষ যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের তত্ত্ববিজ্ঞান বোঝেন, তিনি কখনও ভাবেন না, "এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রী আমার সম্পদ-সম্পত্তি বলে আমি গ্রহণ করেছি। ঐগুলি আমার ভোগতৃপ্তির জন্যে তৈরি হয়েছে।" তেমনই যদি শরীরটি কোনও চমৎকার কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে কোনও কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ উল্লসিত হয়ে ওঠে না, কিংবা কোনও ভাবে কোনও কাজে শরীর ব্যর্থ হলে সে বিমর্ষ হয় না। অন্যভাবে বলা চলে যে, কৃষ্ণভাবনা বলতে বোঝায় স্থূল ও জড় বস্তুসামগ্রীর সাথে সর্বপ্রকার আত্মিক সংযোগ বর্জন করা। ভগবানের শক্তিসমন্বিত প্রতিভূ মায়ার নির্দেশে সক্রিয় ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে সেইগুলির ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করা উচিত। সকাম কার্যকলাপে মগ্ন মানুষ মহামায়া, অর্থাৎ জড়জাগতিক অস্তিত্বের পরিণামস্বরূপ দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা ভোগ করবার জন্যই সেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধীনে কাজ করতে থাকে। অন্য দিকে, ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি তথা যোগমায়া নামে প্রভাবের অধীনে সন্তুষ্টমনে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিসেবা নিবেদনের কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই, ভগবান স্বয়ং তাঁর অগণিত শক্তিরাজির মাধ্যমে, সকল কর্মের কর্তা হয়েই থাকেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, জীবনের শরীর বিষয়ক ধারণার দ্বারা অবিচলিত মানুষ, জড়জাগতিক বাসনাদি ও মানসিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী হলে, তাকে আত্মপ্রবঞ্চক এবং অতি নিম্নস্তরের বদ্ধ জীব বলা চলে।

শ্লোক ১০

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা ।
বর্তমানোঽবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥

দৈব—মানুষের পূর্বকৃত প্রারব্ধ সকাম ক্রিয়াকলাপ; **অধীনে**—যা অধীনস্থ; **শরীরে**—জড় দেহের মধ্যে; **অস্মিন্**—এর মাঝে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী; **ভাব্যেন**—যার দ্বারা উৎপাদিত হয়; **কর্মণা**—সকাম ক্রিয়াকলাপের দ্বারা; **বর্তমানঃ**—অবস্থিত; **অবুধঃ**—যে বুদ্ধিহীন; **তত্র**—দৈহিক কার্যকলাপের মাঝে; **কর্তা**—কর্মী; **অস্মী**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **নিবধ্যতে**—আবদ্ধ হয়ে থাকে।

অনুবাদ

প্রারব্ধ কর্মফলের পরিণামে দেহমধ্যে আবদ্ধ বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে, "আমি সকল কাজের কর্তা।" অহমিকায় বিভ্রান্ত তেমন নির্বোধ মানুষ তাই সকাম ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণাবলীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

পরম সত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরেই জীব নির্ভরশীল, কিন্তু মিথ্যা অহমিকার ফলে, সে পরমেশ্বর ভগবানকে অগ্রাহ্য করে এবং নিজেকেই সকল কাজের কর্তা বলে মনে করে। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, রাজা যেভাবে বিদ্রোহী প্রজাকে শাস্তি দেয়, পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই পাপাত্মক জীবকে মায়াবলে দেহ থেকে দেহান্তরে প্রেরণ করে থাকে।

শ্লোক ১১

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে ।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু ।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিরক্তঃ**—জাগতিক উপভোগে অনাসক্ত; **শয়নে**—শুয়ে থাকতে; **আসন**—বসে থাকতে; **অটন**—বেড়াতে; **মজ্জনে**—কিংবা স্নান করতে; **দর্শন**—দেখতে; **স্পর্শন**—স্পর্শ করতে; **ঘ্রাণ**—ঘ্রাণ নিতে; **ভোজন**—খেতে; **শ্রবণ**—শুনতে; **আদিষু**—এবং ইত্যাদি; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **বধ্যতে**—বাধ্য হয়; **বিদ্বান্**—বুদ্ধিমান লোক; **তত্র তত্র**—যেখানে সে যায়; **আদয়ন্**—অভিজ্ঞতা লাভের অনুকূল; **গুণান্**—জড়প্রকৃতির গুণাবলীর সৃষ্টি ইন্দ্রিয়াদি।

অনুবাদ

বিদ্বান জ্ঞানবান মানুষ অনাসক্তির অভ্যাসে দৃঢ়চিত্ত হলে তাঁর শরীরটিকে শোয়া, বসা, চলাফেরা, স্নান করা, দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, আহার করা, শোনা এবং এই ধরনের সব কাজেই উপযোগ করেন, কিন্তু কখনই সেই ধরনের কাজকর্মে আসক্ত হয়ে পড়েন না। অবশ্য, সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকলেও তিনি সেই সকল কাজের বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে তিনি শুধুমাত্র তাঁর শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিয়োজিত রাখেন এবং বুদ্ধিহীন মানুষদের মতো সেই সকল কাজের মধ্যে বিজড়িত হয়ে পড়েন না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব প্রশ্ন করেছিলেন কেন জ্ঞানবান মানুষও বদ্ধজীবের মতো বাহ্যিক দেহগত ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত হন। এখানে ভগবানের উত্তর রয়েছে। দেহগত ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত হওয়ার সময়ে, কোনও বুদ্ধিহীন মানুষ জড়জাগতিক জীবনের পদ্ধতি ও পরিণাম উভয় বিষয়েই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাই জড়জাগতিক কর্মক্ষেত্রে নিদারুণ দুঃখকষ্ট এবং হর্ষ উল্লাস বোধ করতে থাকে। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জীব অবশ্য সাধারণ মানুষদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এবং দুঃখকষ্টের ঘটনাদির পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেহগত ক্রিয়াকলাপ সামান্য মাত্রাতেও উপভোগের প্রচেষ্টায় ভুল করেন না। তার পরিবর্তে তিনি নিরাসক্ত সাক্ষী হয়ে থাকেন, শুধুমাত্র দেহ পরিচর্যার স্বাভাবিক কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয়াদি উপযোগ করেন। *আদয়ন্* শব্দটির মাধ্যমে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে যে, জড়জাগতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ আত্মসত্তাটি ছাড়া অন্য কিছু কাজে লাগিয়ে থাকেন।

শ্লোক ১২-১৩

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ ।
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ততে ॥ ১৩ ॥

প্রকৃতি—জড়জাগতিক পৃথিবীতে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **অসংসক্তঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **সবিতা**—সূর্য; **অনিলঃ**—বাতাস; **বৈশারদ্যা**—অতি বিশারদের দ্বারা; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টি; **অসঙ্গ**—অনাসক্তির মাধ্যমে; **শিতয়া**—অভ্যস্ত; **ছিন্ন**—কাটা; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **প্রতিবুদ্ধঃ**—জাগরিত; **ইব**—মতো; **স্বপ্নাৎ**—স্বপ্ন থেকে; **নানাত্বাৎ**—জড় জগতের বৈচিত্র্যের দ্বৈতভাব; **বিনিবর্ততে**—বিমুখ বা অনাসক্ত হয়।

অনুবাদ

যদিও আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য সব কিছুরই আশ্রয়স্থল, তা হলেও আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়ে না। তেমনই, অসংখ্য জলাশয়ের মধ্যে সূর্য প্রতিফলিত হলেও তা জলের মধ্যে মোটেই আসক্ত হয় না, শক্তিশালী বাতাস সর্বত্র বয়ে চলতে থাকলেও অগণিত প্রকার গন্ধের দ্বারা তা বিকৃত হয় না, বা যে সব পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে যায়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইভাবেই আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুষও জড়দেহ থেকে এবং চারপাশের জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত থাকেন। তিনি যেন স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতোই থাকেন। অনাসক্তির দ্বারা সুতীক্ষ্ণ সুদক্ষ দর্শন শক্তির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সকল প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিন্ন করেন এবং জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের প্রসারতা থেকে তাঁর চেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষ তাঁর যথার্থ চিন্ময় সত্তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সন্দেহ ছিন্ন করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর এবং তাই তাঁর অপেক্ষা ভিন্ন কোনও পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব নয়। এই ধরনের সুদক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই সর্বপ্রকার দ্বিধা সন্দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা যায়। এখানে তাই বলা হয়েছে, *প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তঃ*—আকাশ, সূর্য কিংবা বাতাসের মতোই, আত্ম উপলব্ধি যার হয়েছে, তার আর বন্ধনদশার কোনও ভয় নেই। ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টির মাঝে অবস্থিত থাকলেও কোনও প্রকার আসক্তি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। *নানাত্ব* অর্থাৎ "জড়জাগতিক বৈচিত্র্য," বলতে মানুষের জড়জাগতিক দেহ, অন্য সকলের দেহ এবং মানসিক ও দৈহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অগণিত সেবাপরিকরাদি বোঝায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে শুদ্ধসত্ত্বের জাগরণ হলে, মানুষ তখন মায়াময় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সবরকম আগ্রহ থেকে পরিপূর্ণ

নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে এবং শরীরের মধ্যে বিরাজমান আত্মার ক্রমশ উপলব্ধির চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হতে পারে। একটি গাছে দুটি পাখির দৃষ্টান্তটির মধ্যে তাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তাসম্পন্ন। যদি মানুষ ভগবানের অভিমুখে মনোযোগী হয়, এবং তাঁর উপরে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁকেই শাশ্বত নির্ভর রূপে বরণ করতে পারে, তা হলে আর কোনই দুঃখদুর্দশা বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিছুই থাকবে না, তখন জড়জগতের মাঝে অবস্থান করে থাকলেই কোনও কিছুই দুঃখদুর্দশা বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণ হবে না। জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলির অগণিত অভিজ্ঞতা কেবলই মানুষের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা জাগায়, অথচ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি হলেই তৎক্ষণাৎ শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই বুদ্ধিমান মানুষ জড় বৈচিত্র্যের জগৎ থেকে অব্যাহতি নিয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় আত্মতত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ওঠেন।

শ্লোক ১৪

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ ॥ ১৪ ॥

যস্য—যার; **স্যুঃ**—তারা; **বীত**—মুক্ত; **সঙ্কল্পাঃ**—জড়জাগতিক কামনা-বাসনা; **প্রাণ**—প্রাণশক্তি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **মনঃ**—মন; **ধিয়াম্**—এবং বুদ্ধির; **বৃত্তয়ঃ**—ক্রিয়াকলাপ; সঃ—সেই ধরনের মানুষ; **বিনির্মুক্তঃ**—সম্পূর্ণ মুক্ত; **দেহ**—শরীরের মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—এমনকি; **হি**—অবশ্যই; **তৎ**—শরীরের; **গুণৈঃ**—সর্বপ্রকার।

অনুবাদ

যখন কোনও মানুষের কোনও প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনা ছাড়াই তার প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কাজ চলতে থাকে, তখন তাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক শরীরাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই ধরনের মানুষ শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন।

তাৎপর্য

জড় জাগতিক দেহটি এবং মনটি দুঃখদুর্দশা, মায়ামোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, লোভ আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা-উন্মাদনা, হতাশা-বিষাদ ইত্যাদির প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, তবে এই জগতে অনাসক্তভাবে যে বাস করতে পারে, তাকে বিনির্মুক্ত, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত পুরুষ রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন

হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অনুশীলনে নিয়োজিত হলে, প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি সবই পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৫

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া ।
অর্চ্যতে বা ক্বচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥ ১৫ ॥

যস্য—যার; **আত্মা**—দেহ; **হিংস্যতে**—আক্রান্ত হয়; **হিংস্রৈঃ**—পাপাত্মক মানুষ কিংবা হিংস্র পশুদের দ্বারা; **যেন**—অন্য কারও দ্বারা; **কিঞ্চিৎ**—কোনও ভাবে; **যদৃচ্ছয়া**—কোনও প্রকারে; **অর্চ্যতে**—আরাধিত হয়; **বা**—কিংবা; **ক্বচিৎ**—কোনও স্থানে; **তত্র**—তার মধ্যে; **ন**—না; **ব্যতিক্রিয়তে**—ব্যতিক্রম বা প্রভাবিত হয়; **বুধঃ**—যে বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

কখনও আপাত কারণ ব্যতিরেকেই হিংস্র মানুষ কিংবা পশুর দ্বারা কারও শরীর আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্য কোনও সময়ে বা অন্যক্ষেত্রে, অকস্মাৎ মানুষ বিপুল সম্মান কিংবা বন্দনায় ভূষিত হতে পারে। যে মানুষ আক্রান্ত হলেও ক্রুদ্ধ হয় না কিংবা বন্দনা লাভ করলেও উল্লসিত হয় না, তাকেই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ বলা চলে।

তাৎপর্য

কোনও যথার্থ কারণ না থাকলেও যদি কেউ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হয় না এবং যখন বন্দনা বা আরাধনা লাভ করে, তখন উল্লসিত হয় না, তা হলে আত্ম-উপলব্ধি পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে এবং তাকে দিব্য বুদ্ধির পর্যায়ে অবস্থিত বলে স্বীকার করা চলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ*—কি কি লক্ষণাদির দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত মানুষকে চেনা যায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে, অর্জুনকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, সেইভাবেই এখন তিনি একই বিষয়বস্তু উদ্ধবকে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। এই শ্লোকটিতে ভগবান সাধুপুরুষকে সহজে চিনতে পারার লক্ষণগুলি বর্ণনা করছেন, কারণ সাধারণ মানুষকে নিন্দামন্দ করা হলে কিংবা আক্রমণ করলে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আর অন্য কেউ সুখ্যাতি প্রকাশ করলে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরও ঐ ধরনের একটি মন্তব্য আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, কণ্টকবিদ্ধ হলেও যে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে না, তাকেই যথার্থ বুদ্ধিমান বলা চলে এবং চন্দনের মতো শুভ মাঙ্গলিক সহকারে আরাধনা করা হলেও যে মানুষ মনে মনে সন্তুষ্ট হয় না, সে-ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

শ্লোক ১৬

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা ।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জিতঃ সমদৃঙ্ মুনিঃ ॥ ১৬ ॥

ন স্তুবীত—প্রশংসা করে না; ন নিন্দেত—নিন্দা করে না; কুর্বতঃ—যারা কাজকর্ম করছে; সাধু—অতি সুচারুভাবে; অসাধু—অতি অপরিচ্ছন্ন ভাবে; বা—অথবা; বদতঃ—যারা বলে থাকে; গুণ-দোষাভ্যাম্—দোষ-গুণাদি থেকে; বর্জিতঃ—মুক্ত; সমদৃক্—সকল বিষয়ে পারদর্শী; মুনিঃ—মুনি ঋষি।

অনুবাদ

কোনও মুনিঋষি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং তাই জড়জাগতিক বিচারে যা ভাল বা মন্দ, তাতে বিচলিত হন না। অবশ্য, অন্যেরা ভাল মন্দ কাজ করছে, এবং তারা অযথা ও যথার্থ বাক্যালাপ করছে, তা তিনি লক্ষ্য করলেও ঋষিতুল্য মানুষ কাউকেই প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন না।

শ্লোক ১৭

ন কুর্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা ।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ ১৭ ॥

ন-কুর্যাৎ—করা উচিত নয়; ন বদেৎ—বলা উচিত নয়; কিঞ্চিৎ—যা কিছু; ন ধ্যায়েৎ—চিন্তা করা অনুচিত; সাধু অসাধু বা—ভাল কিংবা মন্দ বিষয়; আত্ম-আরামঃ—আত্ম উপলব্ধির প্রচেষ্টায় যিনি আনন্দলাভ করেন; অনয়া—এর সাথে; বৃত্ত্যা—জীবনবৃত্তি; বিচরেৎ—বিচরণ করা উচিত; জড়-বৎ—জড়বুদ্ধি মানুষের মতো; মুনিঃ—ঋষিতুল্য মানুষ।

অনুবাদ

মুক্ত পুরুষ ঋষিতুল্য মানুষের পক্ষে তাঁর শরীর রক্ষার প্রয়োজনে, জড় জাগতিক ভাল কিংবা মন্দ বিচারের মাধ্যমে কোনও কাজ করা, কথা বলা কিংবা চিন্তা ভাবনা করা অনুচিত। বরং অবশ্যই তাঁকে সকল প্রকার জড়জাগতিক পরিবেশ থেকে অনাসক্ত থাকতে হবে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসে আনন্দসুখ অনুভবের মাধ্যমে তাঁকে এই ধরনের মুক্ত জীবনধারার মধ্যে আত্মনিয়োগ করে পরিভ্রমণ করে চলতে হবে, যেন তিনি জড়বুদ্ধি মানুষের মতো অন্য সকলের কাছে প্রতীয়মান হতে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, যে সকল জ্ঞান যোগী পুরুষ তাঁদের বুদ্ধি সহযোগে উপলব্ধির প্রয়াস করে থাকেন যে, তাঁদের জড়জাগতিক দেহটি তাঁদের যথার্থ পরিচয় নয়, তাঁদের জন্য এক ধরনের জীবনদর্শন এই শ্লোকটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মধ্যে যাঁরা আত্মনিয়োজিত থাকেন, তাঁরা অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের উপযোগিতার বিচারেই জড়জাগতিক বিষয়সামগ্রী গ্রহণ এবং বর্জন করে থাকেন। যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত থাকেন, তাঁকে বিশেষ বুদ্ধিমন্ত বলেই লক্ষ্য করা যায় এবং তিনি জড়বৎ আচরণ করেন না—যা এখানে বলা হয়েছে। যদিও ভগবদ্ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য কোনও কাজ করেন না, কোনও কথা বলেন না বা চিন্তা করেন না, তাই তিনি সদাসর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের প্রয়াসে কাজকর্ম, কথাবার্তা এবং চিন্তাভাবনা করতেই খুব কর্মব্যস্ত থাকেন। সমস্ত অধঃপতিত জীবগণ যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলন করে শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের নিজ নিকেতনে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, সেই বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা রচনার কাজেই ভগবদ্ভক্তজন আত্মনিয়োগ করে থাকেন। শুধুমাত্র জড়জাগতিক বিষয়সামগ্রী বর্জন করলেই যথার্থ আত্মোপলব্ধি হয় না। সবকিছুই ভগবানের সম্পদ এবং তা ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, মানুষমাত্রেরই সেইভাবে সকল বিষয়ে শুদ্ধ চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের আন্দোলন প্রসারে নিয়োজিত কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনধারায় জড়জাগতিক বাছবিচার করবার কোনও অবকাশ থাকে না এবং তাই স্বভাবতই তিনি অনায়াসে মুক্ত সাত্ত্বিক জীবনধারায় উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হন।

শ্লোক ১৮

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ১৮ ॥

শব্দব্রহ্মণি—বৈদিক শাস্ত্রাদিতে; **নিষ্ণাতঃ**—সম্পূর্ণ অধ্যয়নের মাধ্যমে অভিজ্ঞ; **ন নিষ্ণায়াৎ**—মনোনিবেশ করে না; **পরে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **যদি**—যদি; **শ্রমঃ**—পরিশ্রম; **তস্য**—তাঁর; **শ্রম**—বিপুল প্রচেষ্টার; **ফলঃ**—ফলাফল; **হি**—অবশ্যই; **অধেনুম্**—যে গাভী দুগ্ধ দান করে না; **ইব**—মতো; **রক্ষতঃ**—রক্ষাকারী।

অনুবাদ

সযত্নে বেদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে যদি কেউ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ না করে, তা হলে যে গাভী দুগ্ধ দান করে না, তার রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর পরিশ্রমী মানুষের মতোই তার অবস্থা হয়। অন্যভাবে বলা চলে যে, বৈদিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমসাধ্য অধ্যয়ন করলে তা শুধুই পণ্ডশ্রম হয়। তা থেকে অন্য কোনও কার্যকরী ফললাভ হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে *পরে* (পরম) শব্দটির দ্বারা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি না করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসঙ্গই নির্দেশিত হয়েছে বলা চলে। কারণ, এই উপদেশাবলীর প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকগুলির মাধ্যমে তাঁর পরম ব্যক্তিসত্তাকেই পরম মর্যাদা প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে কোনও নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্বের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলে তা হবে *একদেশান্বয় উত্তরশ্লোকার্থ তাৎপর্যবিরোধঃ* অর্থাৎ একটি প্রসঙ্গে কথিত অন্যান্য শ্লোকাবলীর সঙ্গে অযৌক্তিক বিরোধিতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্ববিরোধী ব্যাখ্যা তাৎপর্য প্রদানেরই সমতুল্য।

কোনও গাভীর যত্ন নিতে হলে বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। গাভীর আহার্য সংস্থানের জন্য শস্য উৎপাদন করতে হয় কিংবা যথাযথভাবে গোচারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। চারণভূমি যথাযথভাবে পরিচর্যা করা না হলে, বিষাক্ত আগাছা জন্মাবে, কিংবা সাপের উপদ্রব হবে, এবং বিপদের সম্ভাবনা থাকবে। নানাপ্রকার ব্যাধি ও কীটপতঙ্গের দ্বারা গাভীরা সংক্রামিত হয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয় তাই তাদের নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে সংক্রমণ বিরোধী সুব্যবস্থা করতে হয়। তেমনই, গোচারণভূমির চতুর্দিকে বেড়াজাল সংরক্ষণ করাও উচিত এবং আরও অনেক কাজ করবার থাকে। অবশ্য, গাভী যদি দুধ না দেয়, তাহলে মানুষ অনর্থক কঠোর পরিশ্রমই করতে থাকে। তাছাড়া, বৈদিক মন্ত্রাবলীর সূক্ষ্ম এবং গূঢ় অর্থ উপলব্ধির করবার জন্য সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষালাভের প্রয়োজন হয়। যদি সেইভাবে কঠোর পরিশ্রমের পরেও মানুষ জীবনের সকল সুখশান্তির উৎস পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য শরীর সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করতে না পারে এবং সকল বিষয়ের পরম আশ্রয় স্বরূপ শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তা হলে অবশ্যই কোনও যথার্থ ফললাভ ছাড়াই তার বৃথা পণ্ডশ্রম হয়ে থাকে। এমনকি কোনও মুক্তাত্মা পুরুষও এই জীবনের দেহাত্মবুদ্ধি বর্জন করা সত্ত্বেও যদি

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে তারও অধঃপতন ঘটে। *নিষ্ণাত* অর্থাৎ 'বিশেষজ্ঞ' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষকে শেষপর্যন্ত জীবনের যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হতেই হবে, নতুবা তাকে সুদক্ষ সুপণ্ডিত বলা যাবে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—মানব জীবনের যথার্থ লক্ষ্য ভগবৎপ্রেম অর্জন করা, এবং এই লক্ষ্যে উপনীত না হতে পারলে কাউকেই সুদক্ষ বলা চলে না।

শ্লোক ১৯

গাং দুগ্ধদোহামসতীং চ ভার্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাং চ ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ১৯ ॥

গাম্—গাভী; **দুগ্ধ**—যার দুধ; **দোহাম্**—ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে; **সতীম্**—অসতী; **চ**—ও; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **দেহম্**—দেহ; **পর**—অন্যের উপরে; **অধীনম্**—সর্বদা অধীনস্থ; **অসৎ**—অনাবশ্যক; **প্রজাম্**—শিশুরা; **চ**—ও; **বিত্তম্**—ধনসম্পদ; **তু**—কিন্তু; **অতীর্থী-কৃতম্**—যথাযোগ্য মানুষকে না দেওয়া; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **বাচম্**—বৈদিক জ্ঞান; **হীনাম্**—শূন্য; **ময়া**—আমার জ্ঞানের; **রক্ষতি**—রক্ষা করে; **দুঃখ-দুঃখী**—যে ক্রমান্বয়ে দুঃখ ভোগ করে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, যে মানুষ এমন এক গাভীর যত্ন করে, যে দুধ দেয় না, এমন স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, যে অসতী, এবং অন্যের উপরে নির্ভরশীল, অকর্মণ্য সন্তানাদি জন্ম দিয়ে ভরণপোষণ করে কিংবা যথাযোগ্য সেবায় ধনসম্পদ কাজে লাগায় না, তেমন মানুষ অবশ্যই অতি দুর্ভাগা। তেমনই, আমার মাহাত্ম্য বর্জিত বৈদিক জ্ঞানের চর্চা যে করে সেও অতি দুর্ভাগা।

তাৎপর্য

কোনও মানুষকে যথার্থ সুশিক্ষিত বা সুদক্ষ বলা যায় যখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যতকিছু জড়জাগতিক বিষয়াদির অনুভূতি অর্জিত হয়ে থাকে, তা সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অংশপ্রকাশ এবং পরমেশ্বর ভগবানের ভরসা ছাড়া কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এই শ্লোকটিতে বিবিধ প্রকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুকূলে বাচন ক্ষমতা প্রয়োগ করা না হলে, সেই ক্ষমতার কোনই উপযোগিতা

থাকে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যদি সেইগুলিকে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারে নিয়োজিত না করা হয়, তবে সেইগুলি সবই ব্যর্থ হয়। অবশ্য, অবধূত ব্রাহ্মণ পূর্বেই যদুরাজকে বলেছিলেন যে, জিহ্বাকে যদি সংযত না করা হয়, তা হলে মানুষের ইন্দ্রিয় সংযমের সর্বপ্রকার উদ্যোগই ব্যর্থ হয়। জিহ্বা যদি ভগবানের মহিমা প্রচারকার্যে স্পন্দিত না হয়, তা হলে কেউ বাক সংযম করতে পারে না।

দুগ্ধহীন গাভীর দৃষ্টান্তটি তাৎপর্যপূর্ণ। সজ্জন ব্যক্তি কখনও গাভী হত্যা করে না, এবং তাই যখন গাভী বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং আর দুধ দেয় না, তখন তাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবশ্যই কোনও পরিশ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত হতে হয়, কারণ অকেজো গাভী কেউ কিনবে না। কিছুদিন হয়ত বন্ধ্যা গাভীটির লোভী মালিক চিন্তা করতে থাকে, "এই বন্ধ্যা গাভীটার দেখাশোনা করবার জন্য আমি ইতিমধ্যে কত টাকা ঢেলেছি, আর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই গাভীটা আবার শাবকসম্ভবা হবে আর দুধ দেবে।" কিন্তু এই আশা যখন ব্যর্থ হতে দেখা যায়, তখন সে পশুটির স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে অবহেলা করে এবং মন দেয় না। এই ধরনের পাপময় অবহেলার ফলে পরজন্মে অবশ্যই তাকে কষ্ট পেতে হবে, ইহজন্মে বন্ধ্যা গাভীটির জন্য তো ইতিপূর্বেই তাকে কষ্টভোগ করতেই হয়েছে।

সেইভাবেই, কোনও মানুষ যদিও জানতে পারে যে, তার স্ত্রী সাধ্বীও নয়, প্রেমময়ীও নয়, তবুও সে সন্তানাদি লাভের জন্য এমনই আকুল হয়ে ওঠে যে, সেই ধরনের অপ্রয়োজনীয় স্ত্রীরও যত্ন করতেই থাকে, আর ভাবতে থাকে, "আমার স্ত্রীকে সাধ্বী নারী হয়ে ওঠার জন্য ধর্মাচরণে সুশিক্ষা দেব। মহীয়সী নারীদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করলে তার হৃদয়ের পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে, এবং তা হলে সে আমার অপূর্ব স্ত্রী হয়ে উঠবে।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, অসতী স্ত্রীলোক অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয় না এবং তবুও মানুষকে অযথা সন্তানাদির জন্ম দিতে থাকে যারা নিতান্তই তারই মতো নির্বোধ এবং ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে। ঐ ধরনের সন্তানাদি কখনই পিতাকে শান্তি দেয় না, তবু বিরক্তির সঙ্গে পিতা তাদের যত্ন নিতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে থাকে।

তেমনই ভগবানের কৃপায় কেউ সম্পদ সঞ্চয় করলে অবশ্য লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তা যথাপাত্রে এবং যথা উদ্যোগে দান করা হয়। যদি তেমন উপযুক্ত মানুষ কিংবা উদ্যোগ আসে এবং স্বার্থচিন্তা নিয়ে দানধ্যানে দ্বিধা বোধ করে, তা হলে তার সম্মান হানি হয়, এবং পরজন্মে তাকে দারিদ্রপীড়িত হতে হয়। জীবৎকালে

কেউ তার সম্পদ-সম্পত্তি যথোপযুক্তভাবে দানধ্যানে অর্পণ করতে না পারলে, তাকে সারা জীবন উদ্বিগ্ন হয়ে তার সম্পত্তি রক্ষা করেই জীবন কাটাতে হয় যার ফলে তার কোনই সুখ বা যশ লাভ শেষ পর্যন্ত হয় না।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা প্রচার করে না যে বৈদিক জ্ঞান, তা চর্চা করবার জন্য কষ্ট স্বীকারের অনাবশ্যকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে মানুষকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই বেদরাশির দিব্য ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরমতত্ত্ব উপলব্ধির বহু পদ্ধতি প্রক্রিয়া উপনিষদাবলী ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু সেইগুলির অসংখ্য এবং আপাতবিরোধী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলে এবং তাৎপর্য ও অনুশাসনাদির মাধ্যমে ঐ ধরনের শাস্ত্র শুধুমাত্র পাঠ করলেই কেউ পরমতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না। যদি কেউ অবশ্য সকল কারণের পরম কারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে এবং পরমেশ্বর ভগবানেরই মাহাত্ম্য বর্ণনারূপে উপনিষদাবলী এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার পাঠ করেন, তা হলেই তিনি ভগবানের শ্রীচরণকমলে যথার্থ স্থিতি লাভ করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যেভাবে *ঈশোপনিষদ* গ্রন্থটির অনুবাদ এবং তার তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন যে, তার মাধ্যমে পাঠক পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত সান্নিধ্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তরণী যার সাহায্যে জড়জাগতিক অস্তিত্বের বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়। এমন কি ব্রহ্মাও *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, পুণ্যপবিত্র শুভফলপ্রদ ভক্তিমার্গ বর্জন করে যদি কেউ বৈদিক মনগড়া কল্পনার নিষ্ফল পরিশ্রমে অভ্যস্ত হয়, সে নিতান্তই নির্বোধের মতো ধানের পরিবর্তে তুষাঘাত করেই চাল সংগ্রহ করতে চাইছে। শ্রীল জীব গোস্বামী পরামর্শ দিয়েছেন যে, শুষ্ক বৈদিক মনগড়া কল্পনার অভ্যাস একেবারেই বর্জন করা উচিত, কারণ তার মাধ্যমে পরমতত্ত্ব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের লক্ষ্যে তা মানুষকে পথনির্দেশ দিতে পারে না।

শ্লোক ২০

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য ।

লীলাবতারেঙ্গিতজন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ২০ ॥

যস্যাম্—যে শাস্ত্রে; **ন**—না; **মে**—আমার; **পাবনম্**—পবিত্রকারী; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **স্থিতি**—পালন; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **প্রাণ-নিরোধম্**—এবং বিনাশ; **অস্য**—জড়জাগতিক পৃথিবীর; **লীলা-অবতার**—লীলা অবতারদের মধ্যে; **ঈঙ্গিত**—অভিলষিত; **জন্ম**—আবির্ভাব; **বা**—কিংবা; **স্যাৎ**—হয়; **বন্ধ্যাম্**—নিষ্ফল; **গিরম্**—প্রতিক্রিয়া; **তাম্**—এই; **বিভৃয়াৎ**—সমর্থন করে; **ন**—না; **ধীরঃ**—বুদ্ধিমান মানুষ।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, আমার যে সকল ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, সেইগুলির বর্ণনা যে সব শাস্ত্রাদিতে নেই, সেইগুলি বুদ্ধিমান মানুষ কখনই সমর্থন করে না। আমিই তো সমগ্র জড়জাগতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস সাধন করে থাকি। আমার সকল লীলাবতারগণের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। আমার এই সকল ক্রিয়াকলাপ যে জ্ঞানসম্পদের মধ্যে গ্রাহ্য হয়নি, তা নিতান্তই অসার এবং যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

তাৎপর্য

লীলাবতারেঙ্গিতজন্ম শব্দসমষ্টি এখানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভগবানের অবতারের বিস্ময়কর লীলাবিলাস সম্পাদনের নাম লীলাবতার, এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন বিস্ময়কর অবতার-রূপের মহিমা বর্ণিত হয়ে থাকে রামচন্দ্র, নৃসিংহদেব, কূর্ম, বরাহ এবং এইভাবে নানা নামে। অবশ্য এই প্রকার লীলাবতারগণের মধ্যে আজও পর্যন্ত সর্বজনপ্রিয় মূল বিষ্ণুতত্ত্ব রূপে সুবিদিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের আবির্ভাব হয় কংসের কারাগারের মধ্যে এবং অনতিবিলম্বে বৃন্দাবনের গ্রামীণ পরিবেশে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে তাঁর গোপবালক সখা, গোপিকা, পিতা-মাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে অনুপম শৈশব লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। কিছুকাল পরে, ভগবানের লীলাক্ষেত্রে মথুরা ও দ্বারকায় স্থানান্তরিত হয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাদের বেদনাময় বিচ্ছেদ বিরহলীলার মাধ্যমে বৃন্দাবনবাসীদের অনন্য প্রেমলীলা প্রদর্শিত হয়। ভগবানের সেই লীলাবিলাসকে বলা হয় *ঈঙ্গিত* অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সাথে সকল প্রকার প্রেম বিনিময়ের উৎস। ভগবানের শুদ্ধভক্তগণ বিশেষ বুদ্ধিমান হন এবং পরম সত্যস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয়, নিষ্ফল শাস্ত্র তথা সাহিত্য অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে, সেইগুলির দিকে তাঁরা কোনও মনোযোগ দেয় না। যদিও সারা পৃথিবীতে ঐ ধরনের সাহিত্য

সৃষ্টির দিকে সমস্ত জড়জাগতিক মানুষের বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেইগুলি শুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারেই বর্জন করা হয়ে থাকে। এই শ্লোকটিতে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তের জন্য যে সমস্ত শাস্ত্রসম্ভার অনুমোদিত হয়েছে, সেইগুলির মধ্যে পুরুষাবতার ও লীলাবতার সম্পর্কিত লীলাবিলাসের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং সেইগুলি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আবির্ভাবের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, সেকথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যে পরম পুরুষ স্বাংশ কলাদি নিয়মে রামাদিমূর্তিতে স্থিত হয়ে ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করেছিলেন, এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এমনকি বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যেও যেখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মাহাত্ম্য অবহেলিত হয়েছে, তা অগ্রাহ্য করা উচিত। এই কথাটি নারদমুনিও একদা বেদশাস্ত্রাদির রচয়িতা ব্যাসদেবকে বুঝিয়েছিলেন, কারণ তখন ব্যাসদেব তাঁর রচনায় তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি।

শ্লোক ২১

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি ।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্বগে ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে (যা আমি এখন সিদ্ধান্ত করলাম); **জিজ্ঞাসয়া**—বিশেষভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে; **অপোহ্য**—বর্জন করার মাধ্যমে; **নানাত্ব**—জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **ভ্রমম্**—আবর্তনের ভ্রান্তি; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **উপারমেত**—জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত; **বিরজম্**—বিশুদ্ধ; **মনঃ**—মন; **ময়ি**—আমার মধ্যে; **অর্পা**—অর্পণ করে; **সর্বগে**—সর্বব্যাপী।

অনুবাদ

সকল জ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের যে ভ্রান্ত ধারণা মানুষ আত্মার উপরে প্রয়োগ করে, তা বর্জন করা উচিত এবং সেইভাবেই তার

জড়জাগতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তখন আমাতে মনোনিবেশ করা উচিত কারণ আমিই সর্বব্যাপ্ত সত্তা।

তাৎপর্য

যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় পদার্থ ও চিন্ময় আত্মার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে চিন্তাশীল নির্বিশেষবাদী দার্শনিকদের জীবনধারা ও ভাবধারা বর্ণনা করেছেন তবে এখানে তিনি জ্ঞান মার্গ অর্থাৎ মনগড়াকল্পনার পদ্ধতি নস্যাৎ করে দিয়ে চরম সিদ্ধান্ত রূপে ভক্তিমার্গ উপস্থাপন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধি করতে যে পারেনি, তার কাছেই জ্ঞানমার্গ আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

বাসুদেবঃ সর্বমিতি, অর্থাৎ 'বাসুদেবই সর্বেশ্বর' শব্দগুলি এই শ্লোকে উল্লিখিত *সর্বগে* শব্দসমষ্টির মতোই অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক। পরমেশ্বর ভগবান কেন সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন, তা জানা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সর্বপ্রথম শ্লোকটিতেই বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরমেশ্বর ভগবানই সবকিছুর উৎস। আর এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকটিতেও তেমন বলা হয়েছে—তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংসও করেন। তাই ভগবান বাতাস কিংবা সূর্যালোকের মতোই সর্বব্যাপী, শুধু তাই নয়; বরং ভগবান সব কিছুর পরম নিয়ন্তা রূপেই সর্বব্যাপ্ত, যিনি তাঁরই হাতে সকল জীবনের নিয়তি ধারণ করে আছেন।

সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর অভিপ্রকাশ, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়ার প্রয়োজনই নেই। অন্য কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করলেও শ্রীকৃষ্ণের মনোনিবেশ করা হয়, কিন্তু তা যথাযথভাবে হয় না, সে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩ এবং ১৬/১৭) *অবিধিপূর্বকম্* শব্দটির দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভগবান *গীতায়* আরও বলেছেন যে, সমস্ত জীব নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য অজ্ঞানতার ফলে অনেকে পশ্চাদগামী হয় কিংবা মধ্যপথে থেমে যায়, নির্বোধের মতো চিন্তা করে যে, তাদের চলার পথ শেষ হয়ে গেছে; প্রকৃতপক্ষে তখন তারা পরমেশ্বর ভগবানেরই নিকৃষ্টা শক্তির বলে রুদ্ধগতি হয়ে থাকে। যদি কেউ পরম তত্ত্বের প্রকৃতি অন্তরঙ্গভাবে বুঝতে চায়, তবে তাকে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিপ্রেম অনুশীলনের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানকে কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।"

নানাত্ব-ভ্রমম্ শব্দসমষ্টি এই শ্লোকটিতে বোঝায়—স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক বিষয়াদির সঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রম। *ভ্রমম্* শব্দটি বোঝায়-'ভুল'; এছাড়া এই শব্দটির অর্থ 'ভ্রমণ' বা 'বিচরণ' বোঝাতেও পারে। বদ্ধ জীব মায়ার কবলে পতিত হয়ে, তার ভ্রান্তির পরিণামে বিভিন্ন জড় দেহের মাধ্যমে বিচরণ করে থাকে, কখনও দেবতা এবং কখনও মলের কীটরূপে জন্মগ্রহণ করে। *উপারমেত* শব্দটির অর্থ এই যে, এইভাবে নিষ্ফল বিচরণ বন্ধ করা জীবের কর্তব্য এবং পরমতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর ভগবান যিনি সকলের প্রেমাস্পদ তাঁর উদ্দেশ্যেই মনোনিবেশ করা উচিত। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই ভাবাবেগপ্রসূত নয়, বরং একান্তভাবে সুচিন্তিত বুদ্ধিপ্রয়োগ (*জিজ্ঞাসয়া*) করার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে উদ্ধবকে বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের কথা নানাভাবে ভগবান ব্যাখ্যা করবার পরে, তিনি এবার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত স্বরূপ শুদ্ধভগবৎ প্রেম তথা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের বিষয় উত্থাপন করেছেন। এই ধরনের ভগবৎ প্রেম ব্যতীত ভগবানের চিন্তায় নিত্যস্থিত মানসিকতা অর্জন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বিবেক শাস্ত্রসম্ভার থেকে উদ্ধৃত করে, শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, *নানাত্বভ্রমম্* শব্দটির দ্বারা কিছু ভ্রান্তির কথা বোঝানো হয়েছে—জীবকে পরম তত্ত্ব বিবেচনা করা; সমস্ত জীবকে অন্তিমে বিভিন্ন সত্তা না বিবেচনা করে একই সত্তা বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা; বহু ভগবান আছেন তা মনে করা; শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, এমন ভ্রান্তি; এবং জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই পরম তত্ত্ব বিবেচনা করা। এই সমস্ত বিভ্রান্তিকে বলা হয় *ভ্রম* অর্থাৎ ভ্রান্তি, তবে এই ধরনের অজ্ঞতা নিমেষের মধ্যে দূর করা যায়, শুধুমাত্র পবিত্র কৃষ্ণনাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রটি অবিরাম জপ অনুশীলনের মাধ্যমে।

শ্লোক ২২

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্ ।
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ২২ ॥

ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে কেউ দিব্য স্তরে মনোনিবেশ করতে পারে না। সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায় বহু মহা মহা দার্শনিকদের জঘন্য ব্যক্তিগত আচরণ ছিল, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা দার্শনিক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে শুধুমাত্র মনগড়া চিন্তাভাবনাই ছিল বলে দিব্য পারমার্থিক পর্যায়ে বাস্তবিকই তারা মনঃসন্নিবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যদি পূর্বজন্মে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের তেমন সুযোগ লাভের সৌভাগ্য কারও না হয়ে থাকে, এবং তার ফলে জড়বস্তু এবং চিন্ময় সত্তার পার্থক্য সম্পর্কে নিতান্ত মনগড়া কল্পনায় কেউ অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে পারমার্থিক দিব্য স্তরে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সাধ্যসম্মত হয়ে উঠবে না। সেই ধরনের মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক মনগড়া কল্পনার অভ্যাস বর্জন করে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের বাস্তবসম্মত পন্থায় আত্মনিবেদন করা উচিত, যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যেই দিনের ২৪ ঘণ্টাই আত্মস্থ হয়ে থাকার অভ্যাস অর্জন করা যায়। এই ধরনের ভগবৎ সেবামূলক জনহিতকর কাজকর্মে নিয়োজিত থাকার সময়ে, কোনও মানুষেরই নিজের কর্ম ফলের ভোগতৃষ্ণা থাকা অনুচিত। যদিও মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় না। তা সত্ত্বেও নিজের সকল কাজকর্মেরই ফল ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই বাঞ্ছনীয়, তা হলে মন অচিরেই শুদ্ধ অনাসক্তির স্তরে উন্নীত হবে। তখন মনের একমাত্র বাসনা হবে ভগবৎ-প্রীতি সাধনের উদ্যোগ আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সকল কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ ও ক্রিয়াকলাপে যার বিশ্বাস নেই, তার পক্ষে দিব্য স্তরে নিত্যকাল পারমার্থিক শক্তি নিয়ে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। এই শ্লোকটিতে ভগবান সুনিশ্চিতভাবে উদ্ধবকে এবং সকল জীবকে সমস্ত রকমের দার্শনিক ভাবধারার সিদ্ধান্তে উপনীত করেছেন, এবং বুঝিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনই অপরিহার্য কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল কাজকর্মের ফল অর্পণ করাই যদিও জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার যথার্থ উপায়, তা সত্ত্বেও মানুষ মিথ্যা অহমিকায় বিভ্রান্ত হলে, তা করতে চায় না। অজ্ঞানতার ফলেই মানুষ জানে না যে, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকমাত্র এবং তার ফলে জাগতিক মায়ামোহের দ্বৈতভাবের প্রভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। শুধুমাত্র জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে, কোনও মানুষ কখনই মুক্তচিত্ত হতে পারে না, তবে যদি পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে তার কাজকর্ম উৎসর্গ করে দেয়, তা হলেই মানুষ ভগবানের সেবক রূপে তার নিত্য দিব্য মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে।

শ্লোক ২৩-২৪

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ ।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥ ২৩ ॥
মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধালুঃ—শ্রদ্ধাবান মানুষ; **মৎ-কথাঃ**—আমার বিষয়ে বর্ণনা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ; **সুভদ্রা**—সর্বশুভময়; **লোক**—সমগ্র গ্রহলোক; **পাবনীঃ**—পবিত্রকারী; **গায়ন্**—গীত; **অনুস্মরন্**—নিত্য স্মরণের মাধ্যমে; **কর্ম**—আমার ক্রিয়াকলাপ; **জন্ম**—আমার জন্ম; **চ**—ও; **অভিনয়ন্**—নাটকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন; **মুহুঃ**—বারে বারে; **মৎ-অর্থে**—আমার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে; **ধর্ম**—ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ; **কাম**—ইন্দ্রিয় সেবামূলক ক্রিয়াকলাপ; **অর্থান্**—এবং বাণিজ্যিক কাজকর্ম; **আচরন্**—অনুষ্ঠান করে; **মৎ**—আমার মধ্যে; **অপাশ্রয়ঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **লভতে**—লাভ করে; **নিশ্চলাম্**—অবধারিতভাবে; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা; **ময়ি**—আমাতে; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **সনাতনে**—আমার নিত্য স্বরূপের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, আমার লীলাবিলাস ও গুণবৈশিষ্ট্যের বর্ণনা অতীব শুভফলপ্রদ এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তা পরিশুদ্ধ করে তোলে। ভগবৎতত্ত্বে বিশ্বাসী যে মানুষ সদাসর্বদা সেই সকল অপ্রাকৃত দিব্য লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, মহিমা কীর্তন করে এবং স্মরণ করে থাকে, ও নাটকীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আমার লীলা-বিলাসের জীবন্ত রূপ পরিবেশন করে, আমার আবির্ভাবের সূচনা দিয়ে যে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা হয় এবং যে তার সমস্ত ধর্মবিষয়ক, ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং বৃত্তিমূলক কাজকর্মের ফল আমারই প্রীতিবিধানে উৎসর্গ করে থাকে, সে অবশ্যই নিত্য তত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের সামর্থ্য লাভ করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শুধুমাত্র নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির তত্ত্বে যাদের বিশ্বাস এবং শুধুমাত্র অন্তরস্থ পরমাত্মায় যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অবস্থিত অলৌকিক আশ্চর্য ধ্যানমগ্নতার যথার্থ বিষয় নিয়ে যারা চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকে, তাদের পারমার্থিক দিব্য উপলব্ধির পরিধি খুবই সীমায়িত এবং অসম্পূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। অলৌকিক ধ্যানমগ্নতা আর নিরাকার নির্বিশেষবাদী দার্শনিক

মনগড়া কল্পনার উভয় প্রকার ধারণাই যথার্থ ভগবৎ-প্রেমবর্জিত ভাবধারা এবং তাই মানব জীবনের সার্থকতার পথে তার বিবেচনা করা যেতে পারে না। শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন যে করে, তার পক্ষেই নিজ দিব্য আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের যোগ্যতা লাভ সম্ভব হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর মধ্যে বয়স্কা গোপীদের কাছ থেকে মাখন চুরির ইতিবৃত্ত, তাঁর গোপবালকবৃন্দ ও গোপিকাদের সঙ্গে আনন্দময় জীবন উপভোগ, তাঁর বংশীবাদন এবং রাসনৃত্যে যোগদান ইত্যাদি সবই অতি শুভদায়ী চিন্ময় ক্রিয়াকলাপ এবং সেইগুলি সবই বিশদভাবে এই গ্রন্থসম্ভারের দশম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের এই সকল লীলাকাহিনীর মহিমা কীর্তনের উপযোগী বহুসংখ্যক প্রামাণ্য গীত ও প্রার্থনাবলী রয়েছে, এবং সেইগুলি নিত্য নিয়মিত জপকীর্তনের মাধ্যমে মানুষ আপনা হতেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কথা স্মরণের সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকবে। কংসের কারাগারের মধ্যে ভগবান তাঁর জন্মলীলা প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং পরে গোকুলধামে নন্দমহারাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবে তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য প্রতিভাত করেছেন। ভগবান পরে আরও অনেক দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, যেমন, কালিয় সর্পকে দমন ও তিরস্কার এবং অন্যান্য বহু দায়িত্বজ্ঞানশূন্য অসুরদের দমন করে, তিনি কীর্তি স্থাপন করেন। ভগবানের অপ্রাকৃত জন্মোৎসব তথা জন্মাষ্টমির তিথি উদ্‌যাপন এবং তাঁর বিবিধ এইসব লীলাকাহিনীর স্মরণে আয়োজিত উৎসব অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল মানুষেরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। ঐ দিনগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বন্দনা করা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের আরাধনার মাধ্যমে ভগবানের লীলাকাহিনীর স্মরণ করা কর্তব্য।

এই শ্লোকটিতে *ধর্ম* শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই মানুষের সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালিত হওয়া বিধেয়। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণ স্মরণোৎসবে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে শস্যাদি, বস্ত্রাদি বিতরণের মাধ্যমে এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় গাভীকুলের রক্ষণাবেক্ষণের উৎসব আয়োজন করতে হয়। *কাম* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য অপ্রাকৃত লীলা পরিকরাদি অনুশীলনের দ্বারাই সকল মনোবাঞ্ছা পূরণের চেষ্টা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ সামগ্রী নিবেদনের মাধ্যমে মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করে শুধুমাত্র তা সেবন করা উচিত এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি গ্রহণ করে নিজেকে ভূষিত করা এবং শ্রীবিগ্রহের বস্ত্রাদির অংশবিশেষ নিজ দেহে স্থাপন করা উচিত। যিনি

বিলাসবহুল অট্টালিকা কিংবা আবাসনে বসবাস করেন, তাঁর সেই ঘরবাড়ি সবই শ্রীকৃষ্ণের মন্দির করে দেওয়া উচিত এবং অন্য সকলকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে, শ্রীবিগ্রহের সামনে জপকীর্তনের অনুষ্ঠান করে, *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের আয়োজন করে, ভগবৎ-প্রসাদ সেবনের আয়োজন করা উচিত কিংবা বৈষ্ণবমণ্ডলীর সমাজে মনোরম মন্দির ভবনে বসবাস করা উচিত এবং ঐ ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা দরকার। এই শ্লোকটির মধ্যে *অর্থ* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ভগবদ্ভক্তের প্রচারকার্যের উন্নতিকল্পে অর্থসঞ্চয় করা উচিত এবং আপন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন করা অনুচিত। এইভাবে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। *নিশ্চলাম্* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু নিত্য সচ্চিদানন্দময়, তাই যিনি ভগবানের পূজা আরাধনা করে থাকেন, তাঁর জীবনে কখনও কোনও প্রকার বিঘ্ন বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। যদি আমরা ভগবান ছাড়া অন্য কিছুর আরাধনা করি, তা হলে আমাদের আরাধনা বিঘ্নিত হতে পারে কারণ আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ ভ্রান্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ভগবান পরমেশ্বর তাই তাঁর প্রতি আমাদের আরাধনা নিত্য বিঘ্নমুক্ত হয়ে থাকে।

ভগবানের লীলাকাহিনীগুলি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং নাট্যরূপ প্রদানের মাধ্যমে যেজন আত্মনিয়োজিত থাকে, সমস্ত জড়জাগতিক বাসনাদি থেকে অচিরেই তার মুক্তিলাভ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলনে যেজন অগ্রণী হয়েছেন, তিনি পারমার্থিক জগতে বিশেষভাবে ভগবৎ-সেবায় মগ্ন কোনও ভক্তের লীলায় আকৃষ্ট হতে পারেন। কোনও উত্তম ভক্ত এই জগতে সেইভাবে ভগবানের সেবায় আগ্রহী হতে পারেন এবং দিব্য জগতে তাঁর আরাধ্য ভক্তশ্রেষ্ঠজনের সেবা প্রক্রিয়ার নাট্যরূপ প্রদানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে আগ্রহী হন। তা ছাড়া দিব্য ভাবসুন্দর উৎসব অনুষ্ঠানাদি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লীলাবৈচিত্র্যের অনুষ্ঠানাদি, কিংবা অন্যান্য ভগবদ্ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ বিনিময় করতে পারেন। এইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমায় মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিভাব ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। ভগবানের দিব্য ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ, মহিমা কীর্তন বা স্মরণের কোনই অভিরুচি যাদের নেই, তারা নিঃসন্দেহে জড়জাগতিক কলুষচিত্ত মানুষ এবং কখনই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করতেও পারে না। ঐ ধরনের মানুষেরা অস্থায়ী অনিত্য জাগতিক বিষয়াদি যার দ্বারা কোনই স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় না, সেইগুলি

নিয়ে নিজেদের আত্মোনিয়োজিত রাখার ফলে মানব জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা নষ্ট করে ফেলে। সচ্চিদানন্দময় রূপবিশিষ্ট পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিয়ত সেবা অনুশীলন করাই ধর্মাচরণের প্রকৃত তাৎপর্য। ভগবানের পরম আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে মানুষ ভগবানের প্রকৃতি সম্পর্কে নির্বিশেষে নিরাকার ধারণায় সম্পূর্ণ অনাগ্রহী হয়ে ওঠে এবং শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের অনন্ত আনন্দ উপভোগেই ক্রমশ উন্নতি লাভে তার সময়ের সদ্ব্যবহার করতে থাকে।

শ্লোক ২৫

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা ।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥ ২৫ ॥

সৎ—ভগবদ্ভক্তদের; **সঙ্গ**—সান্নিধ্যে; **লব্ধয়া**—লাভ করার মাধ্যমে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **ময়ি**—আমাকে; **মাম্**—আমার; **সঃ**—সে; **উপাসিতা**—পূজারী; **সঃ**—সেই মানুষই; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **মে**—আমার; **দর্শিতম্**—অভিব্যক্ত হয়; **সদ্ভিঃ**—আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের দ্বারা; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **বিন্দতে**—লাভ করে; **পদম্**—আমার পাদপদ্ম অথবা আমার দিব্যধাম।

অনুবাদ

আমার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করে মানুষ আমার উপাসনায় নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে আমার শুদ্ধভক্তদের দ্বারা অভিব্যক্ত আমার পরম ধামে সে অনায়াসে গমন করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের মূল্য সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, কিভাবে সেই আত্মসমর্পণ বা ভক্তিভাব প্রকৃতপক্ষে লাভ করা যায়। ভগবান এই শ্লোকটিতে তার উত্তর দিয়েছেন। ভক্ত সমাজে বাস করা অবশ্যই কর্তব্য, এবং তা হলেই আপনা হতে মানুষ দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের বিবিধ প্রক্রিয়াদির মাঝে আত্মনিয়োগের সুযোগ পায়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের দিব্য ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে দিব্য জগতের পরিবেশ উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন, যাতে কনিষ্ঠ ভক্ত ও ভগবদ্ধামের অভিজ্ঞতার লাভের সুযোগ পায়। সেইভাবে উদ্দীপিত হলে, কনিষ্ঠ ভক্ত আরও উন্নতি লাভ করে এবং ক্রমশ চিদ্‌জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় স্বয়ং আত্মনিয়োগের যোগ্যতা অর্জন করে। অবিরাম ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে এবং তাঁদের কাছ থেকে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের শিক্ষালাভ করার ফলে,

মানুষ অচিরেই ভগবান এবং তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে গভীর আসক্তি অনুভব করতে থাকে এবং এইরূপ আসক্তির মাধ্যমেই ক্রমশঃ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে পরিণতি লাভ করে।

মূর্খ লোকেরা বলে যে, ভগবানের নামগুলি নিয়ে রচিত বিভিন্ন মন্ত্রাবলী এবং মন্ত্রগুলিও নিতান্তই জড়জাগতিক সৃষ্টি মাত্র তাই সেইগুলির বিশেষ মূল্য নেই এবং সেই কারণে মন্ত্রাবলী কিংবা অলৌকিক পদ্ধতি বলতে যা বোঝানো হয়, সেগুলি থেকে একই ফললাভ হয়ে থাকে। এই ধরনের ভিত্তিহীন চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে, ভগবান এখানে জীবের নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের বিজ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। যে সব নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, ভগবানের পবিত্র নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই মায়ামাত্র, তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। মায়া বাস্তবিকই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের সামান্য শক্তিমাত্র, এবং যদি কেউ অজ্ঞতাবশত পরম তত্ত্বের উর্ধ্বে মায়ার মর্যাদা স্থির করতে প্রয়াসী হয়, তাহলে তার পক্ষে ভগবৎ প্রেমের অভিজ্ঞতা অর্জন করা কোনও দিনই সম্ভব হবে না এবং ভগবৎ বিভ্রান্তিই গভীর হয়ে উঠবে। যে সকল ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁদের সাথে ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা ভগবদ্ধামের অস্তিত্ব সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকে। এইসব মানুষ অন্য সকলের মাঝে বিবাদ সৃষ্ট করে দেয়, অবশ্য তাদের ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবৎ-কথা না শুনলে যথাযথভাবে তারা উপলব্ধি করতেও পারে না যে, সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের নিজধাম বাস্তবিকই আছে। এই শ্লোকটিতে তাই যথার্থ ভক্তজন সঙ্গলাভের উপযোগিতা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬-২৭

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সাধুস্তবোত্তমশ্লোক মতঃ কীদৃঙ্বিধঃ প্রভো ।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা ॥ ২৬ ॥
এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো ।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **সাধুঃ**—সাধুজন; **তব**—আপনার; **উত্তম-শ্লোক**—হে প্রিয় ভগবান; **মতঃ**—অভিমত; **কীদৃঙ্বিধঃ**—কোন্ প্রকৃতির সে হবে; **প্রভো**—হে প্রিয়, পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিঃ**—ভক্তিমূলক সেবা; **ত্বয়ি**—আপনার ভগবত্তার

উদ্দেশ্যে; **উপযুজ্যেত**—প্রতিপালিত হওয়া উচিত; **কীদৃশী**—কি ধরনের; **সদ্ভিঃ**—নারদ মুনির মতো আপনার শুদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা; **আদৃতা**—সম্মানিত; **এতৎ**—এই; **মে**—আমাকে; **পুরুষাধ্যক্ষ**—হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল নিয়ামকের নিয়ন্তা; **লোকাধ্যক্ষ**—হে বৈকুণ্ঠপতি; **জগৎ-প্রভো**—হে ব্রহ্মাণ্ডপতি; **প্রণতায়**—আপনার কাছে আত্মসমর্পিত ভক্তের প্রতি; **অনুরক্তায়**—যে আপনাকে ভালবাসে; **প্রপন্নায়**—আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও যার আশ্রয় ভরসা নেই; **চ**—ও; **কথ্যতাম্**—বলা যাক।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, হে পরম পুরুষোত্তম, কি ধরনের মানুষকে আপনি যথার্থ ভক্তরূপে বিবেচনা করেন, এবং মহান শুদ্ধভক্তগণ হতে পারেন কোন্ ধরনের মানুষ ও কি ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক আচরণ আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে বলে শুদ্ধভক্তগণ বিবেচনা করে থাকেন? হে বৈকুণ্ঠপতি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ, আমি আপনার ভক্ত, এবং প্রেমাসক্ত, তাই আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও আমার আশ্রয় নেই। তাই কৃপা করে এই বিষয়ে আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে ভগবানের পরম ধামে গতি লাভ করা যায়। তাই, উদ্ধব স্বভাবতই জানতে চেয়েছেন, যে সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বাস করলে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়, তাঁদের লক্ষণাদি কি কি হয়ে থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান জানেন যথার্থ শুদ্ধ ভক্ত কারা হন, তিনি সদাসর্বদাই তাঁর প্রেমময়ী সেবকবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তেমনই, শুদ্ধভক্তগণও সুচারুভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের যথার্থ পদ্ধতিগুলি কেমন হওয়া উচিত, যেহেতু তাঁরা ইতিপূর্বেই কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে রয়েছেন। এখানে উদ্ধব বিশেষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে তিনি ভক্তের গুণাবলী বিবৃত করেন এবং ভগবানের উদ্দেশে নিবেদনের উপযোগী যে ধরনের ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের বিষয়ে ভক্তগণ স্বয়ং অনুমোদন করে থাকেন, সেইগুলিও বর্ণনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *পুরুষাধ্যক্ষ* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা মহাবিষ্ণুর অধীনস্থ সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের পরম নিয়ন্তা এবং ভগবান তারই নিরঙ্কুশ সর্বময় কর্তৃত্ব ধারণ করে

আছেন। *লোকাধ্যক্ষ* সংজ্ঞাটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বৈকুণ্ঠ গ্রহমণ্ডলীর সর্বময় পর্যবেক্ষণকারী অধিকর্তা, এবং ভগবান অনন্ত গুণময় ও সর্বার্থসার্থক পরম নিয়ন্তা। উদ্ধব এছাড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *জগৎপ্রভু* রূপে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু মায়াময় জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যেও বদ্ধ জীবগণকে উদ্ধারের অভিলাষে স্বয়ং অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান অপার করুণা প্রদর্শন করেছেন। *প্রণতায়* (আপনার কাছে আত্মসমর্পিত ভক্ত) শব্দটি বোঝায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে প্রণত হতে চায় না যে সকল মূর্খ জনসাধারণ, উদ্ধব তাদের মতো উদ্ধত মানুষ নন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মন্তব্য অনুসারে, উদ্ধব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি *অনুরক্তায়,* অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ প্রেমাসক্ত, কারণ অর্জুনের মতো অন্যান্য মহান ভক্তবৃন্দ কোনও সময়ে সামাজিক রীতিনীতির আনুকূল্যে কিংবা গ্রহমণ্ডলী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেবতাদের মান মর্যাদার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আরাধনা নিবেদন করা হলেও, উদ্ধব সদাসর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্তভাবে প্রেমাসক্ত হয়ে থাকেন, তিনি কোনও ক্ষেত্রে দেবতাদের পূজা করেননি। সুতরাং, উদ্ধবকে বলা হয়েছে *প্রপন্নায়,* অর্থাৎ তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কারও কাছে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

শ্লোক ২৮

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **ব্রহ্ম পরমম্**—পরমতত্ত্ব; **ব্যোম**—আকাশের মতো (আপনি সব কিছু থেকেই অনাসক্ত); **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রকৃতেঃ**—জড়াপ্রকৃতির প্রতি; **পরঃ**—অপ্রাকৃত; **অবতীর্ণঃ**—অবতাররূপে আবির্ভূত; **অসি**—আপনি; **ভগবন্**—ভগবান; **স্ব**—আপনার নিজ ভক্তমণ্ডলীর; **ইচ্ছা**—বাসনা অনুসারে; **উপাত্ত**—স্বীকৃত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **বপুঃ**—শরীরাদি।

অনুবাদ

হে ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বরূপ আপনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত, এবং আকাশের মতো আপনি কোনও কিছুর সাথে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত হন না। তা সত্ত্বেও, আপনার ভক্তবৃন্দের প্রেমবন্ধনে আবিষ্ট হয়ে, আপনার ভক্তবৃন্দের বাসনামতে বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ সমগ্র জগৎব্যাপী ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের প্রথা প্রচার করে থাকেন, এবং তাই, ভগবানের নিজরূপ থেকে ভিন্ন হলেও তাঁদের সকলকেই

ভগবানের কৃপা ও শক্তি বিকাশেরই অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (অন্ত্য ৭/১১) রয়েছে—*কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।*

ভগবান ঠিক যেন আকাশ *(ব্যোম)* এরই মতো, সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে থাকলেও, তিনি কোনও কিছুরই সাথে সম্পৃক্ত থাকেন না। তিনি যথার্থই *প্রকৃতেঃ পরঃ*, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত। ভগবান সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত এবং তাই তিনি জড়জাগতিক ঘটনাবলীর প্রতি নিস্পৃহ থাকেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, ভগবান শুদ্ধ ভক্তিসেবার সুযোগ বিস্তার করে রাখতেই অভিলাষী, এবং এই কারণেই তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবাত্মাগুলিকে উন্নত করে তোলার জন্য জড় জগতের মাঝে অবতাররূপে আসেন।

ভগবান তাঁর প্রেমাকুল ভক্ত সমাজকে সন্তুষ্ট করার মানসে সুনির্বাচিত দিব্য শরীরাদির মাধ্যমে অবতরণ করে থাকেন। কখনও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিবিধ রূপ অবলম্বন করে বিশেষ ভক্তবৃন্দের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন, যার ফলে তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেমরসানুভূতি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে সক্ষম হন। ভগবদ্ভক্তবৃন্দের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত শ্রীল জীব গোস্বামী দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জাম্ববানের ঘরে গিয়েছিলেন এবং ঈষৎ রুষ্টভাব গ্রহণ করে সেখানে তাঁর রূপ অভিব্যক্ত করেছিলেন। সেই রূপ ধারণ করে, ভগবান তাঁর ভক্তের সাথে যুদ্ধ বিবাদের আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। ভগবান তাঁর দত্তাত্রেয় রূপ গ্রহণের মাধ্যমে অত্রিমুনির কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেইভাবে ব্রহ্মাকেও তাঁর কৃপা প্রদান করেছিলেন; তা ছাড়া বিভিন্ন দেবতা, অক্রূর এবং অন্যান্য অগণিত ভক্তমণ্ডলীকেও কৃপা বিতরণ করেছিলেন। আর বৃন্দাবনের ভাগ্যবান ব্রজবাসীদের কাছে ভগবান তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ পরিগ্রহের মাধ্যমে লীলাবিলাস করেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য *প্রকাশসংহিতা* থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "ভগবান তাঁর ভক্তগণের অভিলাষ অনুযায়ী বিভিন্ন চিন্ময় শরীর ধারণ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বসুদেব ও দেবকীর পুত্রসন্তানরূপে আবির্ভাবে ভগবান সম্মত হয়েছিলেন। তাই, যদিও কৃষ্ণের রূপ সচ্চিদানন্দময়, তা সত্ত্বেও তাঁর ভক্তের শরীরের মধ্যে অবস্থানের ফলে সেই ভক্ত তাঁর জননী হয়েছিলেন। যদিও আমরা ভগবানের 'কোনও শরীরের মধ্যে রূপধারণের' কথা বলে থাকি, বাস্তবক্ষেত্রে ভগবান তাঁর রূপ পরিবর্তন করেন না, বরং বদ্ধ জীবেরাই তাদের শরীর পরিবর্তন করে থাকে। ভগবান তাঁর নিত্য শাশ্বত অপরিবর্তনশীল শরীরাদির মধ্যেই আবির্ভূত হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই তাঁর প্রিয় ভক্তবৃন্দের একান্ত অভিলাষ অনুসারেই রূপ গ্রহণ

করেন, তিনি কখনই অন্য কোনও রূপে আবির্ভূত হন না। অবশ্য, যদি কেউ মনে করে যে, ভগবান সাধারণ কোনও মানুষের মতোই জন্ম গ্রহণ করেন বলেই বসুদেবের তথা অন্য কোনও ভক্তের দেহজাত পুত্র হয়ে যায়, তা হলে বিভ্রান্ত হতে হবে। ভগবান নিতান্তই তাঁর চিন্ময় শক্তি বিস্তার করে থাকেন, যার ফলে তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে তিনি চিন্তা করান, 'কৃষ্ণ এখন আমার পুত্র'। সেই কারণেই বোঝা উচিত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই কোনও জড় দেহ গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন না, কিংবা তিনি কখনও তাঁর নিত্য শাশ্বত চিন্ময় রূপ পরিত্যাগও করেন না; বরং ভগবান তাঁর নিত্য শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রেমাকুল ভাবধারা অনুসারেই তাঁর আনন্দময় শরীরাদির মাধ্যমে নিত্যকাল আপনাকে অভিব্যক্ত করে থাকেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, *ব্যোম* শব্দটিও ভগবানেরই নাম পরব্যোম, অর্থাৎ চিন্ময় আকাশের অধিপতি বোঝায়। এই শ্লোকটি থেকে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা অনুচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক আকাশের মতোই বুঝি নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্ব, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিতান্তই অন্য যে কোনও অবতার রূপের মতোই সম মর্যাদাসম্পন্ন। এই ধরনের সংকীর্ণ এবং আকস্মিক চিন্তাভাবনার দ্বারা যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণই আদি অকৃত্রিম পরমেশ্বর ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*), এবং *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনিই সবকিছুর মূল উৎস। সুতরাং, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের আদিরূপের সাথে প্রেমময় সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হয়েই থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেম জাগরিত করাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* সামগ্রিক উদ্দেশ্য, এবং এই মহান উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে নির্বোধের মতো ভ্রান্তধারণা পোষণ করা অনুচিত।

শ্লোক ২৯-৩২

শ্রীভগবানুবাচ

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ ।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ ২৯ ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ ৩০ ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ৩১ ॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কৃপালুঃ**—অন্য সকলের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে অক্ষম; **অকৃত-দ্রোহঃ**—অন্য কাউকে আঘাত না করে; **তিতিক্ষুঃ**—ক্ষমা করে; **সর্ব-দেহিনাম্**—সকল জীবের প্রতি; **সত্য-সারঃ**—সত্যবাদী এবং সত্যপথে ধীর স্থির; **অনবদ্য-আত্মা**—ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত আত্মা; **সমঃ**—সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন আত্মা; **সর্ব-উপকারকঃ**—সকলের উপকারের জন্য সদা প্রচেষ্ট; **কামৈঃ**—স্বাভাবিক বাসনায়; **অহত**—অবিচলিত; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **দান্তঃ**—বহিরিন্দ্রিয়াদির সংযমে; **মৃদুঃ**—রূঢ় মনোভাব রহিত; **শুচিঃ**—সদা সৎস্বভাবী; **অকিঞ্চনঃ**—কোনও কিছু ভোগ অধিকার শূন্য; **অনীহঃ**—জাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত; **মিতভুক্**—স্বল্প আহারী; **শান্তঃ**—মন স্থির করে; **স্থিরঃ**—নিজ কর্তব্যকর্মে স্থির প্রতিজ্ঞ; **মৎ-শরণঃ**—আমাকে একমাত্র আশ্রয় স্বীকারের মাধ্যমে; **মুনিঃ**—মনস্বী; **অপ্রমত্তঃ**—সদাসতর্ক এবং ধীরস্থির; **গভীর-আত্মা**—লঘুচিত্ত নয়, তাই ধীর স্বভাব; **ধৃতিমান্**—বিঘ্নময় পরিস্থিতিতেও দুর্বলমনা কিংবা দুঃখভারাক্রান্ত নয়; **জিত**—জয় করার পরে; **ষট্-গুণঃ**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মোহ, জরা ও মৃত্যু নামে ছয়টি জড়জাগতিক গুণাবলী; **অমানী**—সম্মানের আকাঙ্ক্ষাশূন্য; **মানদঃ**—সকলকে মান্যতা প্রদান; **কল্যঃ**—অন্য সকলের মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভিরুচি পুনরুজ্জীবন; **মৈত্রঃ**—অন্য মানুষকে কখনও বঞ্চিত না করা এবং সেইভাবে যথার্থ বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া; **কারুণিকঃ**—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে সদাসর্বদা কারুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজকর্ম; **কবিঃ**—পূর্ণজ্ঞানী; **আজ্ঞায়**—জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে; **এবম্**—এইভাবে; **গুণান্**—গুণাবলী; **দোষান্**—দোষাবলী; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদিষ্টান্**—প্রশিক্ষিত হয়ে; **অপি**—এমনকি; **স্বকান্**—নিজের; **ধর্মান্**—ধর্মনীতি; **সন্ত্যজ্য**—পরিত্যাগের মাধ্যমে; **যঃ**—যিনি; **সর্বান্**—সকল; **মাম্**—আমাকে; **ভজেত**—ভজনা করে; **সঃ**—সে; **তু**—অবশ্য; **সত্তমঃ**—সাধুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে উদ্ধব, সাধুব্যক্তি কৃপাময় হন এবং অন্যকে মর্মাহত করেন না। অন্যেরা উগ্রস্বভাব হলেও, তিনি সহনশীল হন এবং সর্বজীবে ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর জীবনের শক্তি ও সামর্থ্য আসে পরম সত্য থেকে; তিনি সকল ঈর্ষা দ্বেষ মুক্ত হন, এবং তাঁর মন সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন থাকে। তাই, তিনি অন্য সকলের কল্যাণে কাজ করার জন্য সময় উপযোগ

করেন। জড়জাগতিক কামনা-বাসনায় তাঁর মন ও বুদ্ধি কখনও বিভ্রান্ত হয় না, এবং তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে পেরেছেন। তাঁর আচরণ সদা শান্ত, প্রীতিপূর্ণ, কখনও কর্কশ হয় না এবং সর্বদা অনুসরণযোগ্য, তিনি লোভবর্জিত হন। তিনি জড়জাগতিক সাধারণ কাজকর্মে কখনও উদ্যোগী হন না, এবং কঠোরভাবে তিনি আহারাদির সংযম করে থাকেন। তাই তিনি সদাসর্বদাই শান্ত এবং ধীরস্থির হয়ে থাকেন। সাধুব্যক্তি চিন্তাশীল হন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে স্বীকার করে থাকেন। এই ধরনের মানুষ সদাসর্বদাই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বিশেষ সতর্ক হন এবং কখনও সংকীর্তনমনা হয়ে মনোভাব পরিবর্তন করেন না, কারণ তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের মতোই জটিল পরিস্থিতিতেও সক্রিয় থাকেন। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মোহ, জরা ও মৃত্যুর মতো ষড় দোষে বিচলিত হন না। তিনি মান সম্মানের সকল বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং অন্য সকলকে সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি অন্য সকলের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ এবং তাই কখনও কোন মানুষকে প্রবঞ্চনা করেন না। বরং, তিনি সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হন এবং কৃপাপরায়ণ হন। এই ধরনের সজ্জন মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানী পুরুষ বলেই মনে করা উচিত। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে আমার দ্বারা অনুমোদিত সাধারণ ধর্মাচরণগুলির মাধ্যমে যে সকল সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাস নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইগুলি মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি জানেন যে, সেই কর্তব্যকর্মগুলিতে অবহেলা প্রদর্শন করলে মানুষের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য আমার শ্রীচরণপদ্মে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে সাধু সজ্জনগণ অবশেষে ঐ সমস্ত সাধারণ ধর্মাচরণগুলি বর্জন করে এবং আমাকেই শুধুমাত্র ভজনা করে থাকে। এইভাবেই সকল জীবকুলের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে গণ্য করা হয়।

তাৎপর্য

২৯ থেকে ৩১ সংখ্যক শ্লোকাবলী সজ্জন ব্যক্তির আটাশটি গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছে এবং ৩২ সংখ্যক শ্লোকটিতে জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা আলোচিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুসারে, সপ্তদশ সংখ্যক গুণটি (*মৎ-শরণ*, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগত হওয়া) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এবং অন্য সাতাশটি গুণাবলী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্‌গত হয়ে থাকে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে—*যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*। উপরোক্ত আটাশটি সৎগুণাবলী নিম্নরূপে বর্ণিত হতে পারে।

(১) *কৃপালু*—অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত পৃথিবী এবং মায়ার কশাঘাতে জর্জরিত জীবকুলের দুর্দশায় ভক্ত অসহনীয় যন্ত্রনা বোধ করেন। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে ব্যস্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁকে কৃপালু অর্থাৎ দয়াময় মানুষ বলা হয়।

(২) *অকৃতদ্রোহ*—যদি কখনও কেউ ভক্তের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করে, তা হলে তার পরিবর্তে ভক্ত কখনও অসম্মানজনক প্রত্যুত্তর দেন না। বাস্তবিকই, তিনি কখনই কোনও জীবের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন না। বলা যেতে পারে যে, মহান বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাজাগণও, যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ বহু অপরাধীর দণ্ড প্রদান করেছিলেন। অবশ্যই, যখন যথাযথভাবে সুবিচার প্রদানে রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়, তার ফলে পাপী তথা বিনষ্টকারী মানুষগুলি বাস্তবিকই তাদের শাস্তিভোগের ফলে উপকৃত হয়, কারণ—তারা তাদের অবৈধ কার্যকলাপের ভয়ানক কর্মফলের পরিণাম থেকে মুক্তিলাভ করে। কোনও বৈষ্ণবভাবাপন্ন সুশাসক ঈর্ষা-বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তিনি ভগবানের বিধান মতোই বিশ্বস্তভাবে অনুশাসন পালন করে থাকেন। যে সব মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব নেই মনে করার ফলে ভগবান সম্পর্কিত সকল ধারণাই নষ্ট করে ফেলতে চায়, অবশ্যই তারা *কৃতদ্রোহ*, অর্থাৎ তারা নিজেদের এবং অন্য সকলের প্রতি বিষম ক্ষতিকারক রূপে গণ্য হয়। নিরাকার নির্বিশেষবাদী মনে করে যে, সে নিজেই পরম পুরুষ এবং তার ফলে নিজের জীবনে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং তার অনুগামীরাও বিপদগ্রস্ত হয়। তেমনই, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সন্ধানে আত্মস্থ কর্মীরাও তাদের আত্মসত্তার হনন করে থাকে, কারণ তাদের জড়জাগতিক ভাবনা-চেতনার মাঝে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার পরিণামে, তারা পরম তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সকল সুযোগ হারায় এবং তাদের নিজেদের সত্তা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতেও শেখে না। সুতরাং, জড়জাগতিক বিধিনিয়মাদি এবং কর্তব্যকর্মগুলির অধীনস্থ হয়ে সকল জীবমাত্রই অকারণে অন্যদের এবং নিজেদেরও বিব্রত করে রাখে, 'আর যে কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবই তাদের জন্য গভীর অনুশোচনা এবং দুশ্চিন্তা ভোগ করতে থাকে। কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার দেহ, মন ও বাক্যের মাধ্যমে কোনও জীবের কোনও ক্ষতিকারক কাজ করেন না।

(৩) *তিতিক্ষু*—ভক্তের দেহ-মনে কেউ কোনওভাবে আঘাত করলে, ভক্ত তাকে ক্ষমা করেন। সাধারণত বৈষ্ণবগণ মলমূত্র, রক্ত পুঁজ ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ তাঁর দেহটির ভাবনা থেকে নিজে অনাসক্তভাবেই থাকেন। অতএব প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকার সময়ে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর নানা প্রকার আচার ব্যবহারের

পরিচয় পেলেও ভক্তগণ তা উপেক্ষা করতে জানেন এবং সকলের সাথে সর্বদা ভদ্রজনোচিত আচরণ করে থাকেন। বৈষ্ণব সোচ্চারে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করে থাকেন এবং শুদ্ধ ভক্তদের আচরণের যথাযথ আদান প্রদান করতে যারা পারে না, সেই সকল বদ্ধ জীবদের সঙ্গে বৈষ্ণবভক্ত সহনশীল আচরণ করেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করেন।

(৪) *সত্যসার*—ভগবদ্ভক্ত নিয়ত স্মরণ রাখেন যে, সর্বশক্তিমান, সকল সুখের উৎস এবং সকল ক্রিয়াকলাপেরই পরম ভোক্তা রূপে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই তিনি নিত্য সেবক। ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের অতিরিক্ত অন্য সকল প্রকার কাজকর্ম পরিহারের মাধ্যমে, ভক্তজন সত্য পথে অবিচল থাকেন, সময়ের অপব্যয় করেন না এবং তার ফলে সাহসী, শক্তিমান এবং দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠেন।

(৫) *অনবদ্যাত্মা*—ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, জড়জাগতিক পৃথিবী নিতান্তই অনিত্য কল্পনাট্যেরই মতো এবং তাই তিনি কোনও জাগতিক পরিবেশে কোনও ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা দ্বেষে বিজড়িত হন না। তিনি কোনও মানুষকে কখনই উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন না কিংবা অনাবশ্যক তাদের নিন্দামন্দও করেন না।

(৬) *সম*—জড়জাগতিক সুখে বা দুঃখে, যশ বা অপযশে ভগবদ্ভক্ত অবিচল ও সমদর্শী হয়েই থাকেন। তাঁর যথার্থ সম্পদরূপে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনকেই বিবেচনা করেন এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, জড়া প্রকৃতির পরিধির বাইরেই তাঁর যথার্থ শুভ স্বার্থ বিরাজমান রয়েছে। তাই বহির্জগতের ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে তিনি উত্তেজিত কিংবা অবসন্ন হন না, বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তার চেতনার প্রতি তিনি দৃঢ়চিত্ত হয়েই থাকেন।

(৭) *সর্বোপকারক*—নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাসনাদি বর্জন এবং অন্যের প্রীতিসাধনের জন্য কাজ করার প্রবণতাকে *পরোপকার* বলা হয়, তেমনই নিজের সুখসুবিধার জন্য অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করার নাম *পরাপকার*। সকল জীবের পরম আশ্রয় স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যেই ভগবদ্ভক্ত সদাসর্বদা কাজ করে চলেন, এবং তাই যে কোনও ভক্তেরই ক্রিয়াকলাপ সকলের কাছেই প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনই জনকল্যাণমূলক কাজের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়, কারণ—প্রত্যেকেরই সুখ দুঃখ কল্যাণ প্রগতির পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মূর্খ লোকেরা মিথ্যা আত্মম্ভরিতার প্রভাবে, অন্য সকল মানুষের পরম কল্যাণকামী বলে নিজেদের জাহির করার ফলে, নিত্য সুখ শান্তির বিধানে মনোযোগী না হয়ে কতকগুলি আপাত

কল্যাণকর জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপে মত্ত হয়ে থাকে। যেহেতু ভগবদ্ভক্ত ভক্তি কথা প্রচারে শুদ্ধ মনোভাব নিয়ে আত্মনিয়োজিত থাকেন, তাই তিনিই প্রত্যেক মানুষের পরম সুহৃদ।

(৮) *কামৈরহতধী*—সাধারণ মানুষ মাত্রই সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়বস্তুকে তাদের নিজেদের সুখভোগের জন্য নির্ধারিত হয়েছে বলে মনে করে থাকে এবং তাই সেইগুলির দখল করতে কিংবা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়। তার পরিণামে মানুষ একজন নারীকে অধিকার করতে চায় এবং তার সাথে মৈথুন সুখ উপভোগ করতে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান তাই মানুষের অন্তরে বেদনাময় কামনা-বাসনার আগুন জ্বালিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষিত দাহ্য বিষয়াদি অর্পণ করেও থাকেন, কিন্তু ভগবান ঐ ধরনের মতিচ্ছন্ন মানুষকে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির আশীর্বাদ প্রদান করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য এবং নিরপেক্ষ সত্তার পরম অধিকারী, কিন্তু যদি কেউ ভগবানের সৃষ্টি আত্মসাৎ করতে আগ্রহী হয়, তখন ভগবান তাঁর মায়াবলে তাকে তেমন সুযোগ-সুবিধা করেই দিয়ে থাকেন, এবং তার ফলে মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যে একজন বিপুল কামনা-বাসনালব্ধ ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষের মিথ্যা ভূমিকায় নিজেকে বিজড়িত করার মাধ্যমে যথার্থ সুখ আস্বাদনের ক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে থাকে। অপরদিকে, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে যথার্থ জ্ঞান ও আনন্দ উপভোগের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে, জড় জগতের লোভনীয় আকর্ষণাদির দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হয় না। শিকারীর বাজানো শিঙা শুনে প্রলুব্ধ হয়ে নির্বোধ হরিণ যেভাবে মারা পড়ে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সেই পথ অনুসরণ করেন না। ভগবদ্ভক্ত কখনই কোনও রূপসী নারীর কামাতুর আহ্বানে আকৃষ্ট হন না এবং জড়জাগতিক বিষয়াদি আহরণের মাধ্যমে নাম যশের প্রলোভনে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য বিভ্রান্ত কর্মীদের কথা শুনতেও চান না। ঠিক সেইভাবেই, কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সুগন্ধী কিংবা সুস্বাদু বিষয়ে বিভ্রান্ত হন না। তিনি ভূরিভোজে আসক্ত হন না, কিংবা দৈহিক সুখসম্ভোগের আয়োজন করার মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করেন না। ভগবানের সৃষ্টি সম্ভারের একমাত্র যথার্থ ভোক্তা স্বয়ং ভগবানই হতে পারেন, এবং জীবগণ নিতান্তই পরোক্ষ ভোক্তা, তাই ভগবানের প্রীতিসাধনের মাধ্যমেই প্রত্যেক জীব অপার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এইভাবে আনন্দ উপভোগের যথার্থ প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ভক্তিযোগ, অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন, এবং ভগবদ্ভক্ত সব রকমের জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনের সম্মুখীন হলেও, কখনই তাঁর স্থিরবুদ্ধির শুভসূচক মর্যাদা বিসর্জন দেন না।

(৯) *দান্ত*—ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতই পাপকর্মাদি থেকে বিরক্তবোধ করেন এবং তাই তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সংযমের উদ্দেশ্যে তাঁর সকল কাজই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করে থাকেন। এই জন্য অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ এবং সতর্ক মনোভাব চর্চার প্রয়োজন হয়।

(১০) *মৃদু*—জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত মানুষ সদাসর্বদাই বন্ধু অথবা শত্রুরূপে সব মানুষকে বিচার করতে থাকে এবং তাই কখনও কঠোর বা কোমল আচরণের মাধ্যমে তার বিরোধীজনকে বশীভূত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। যেহেতু ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, তাই তিনি কোনও মানুষকে শত্রু বলে মনে করেন না এবং কারও দুঃখ কষ্টে আনন্দ-উল্লাস উপভোগের কোনও প্রবণতায় তিনি বিচলিত হন না। সেই কারণেই তিনি *মৃদু*, অর্থাৎ নম্র ও সরল স্বভাবী হন।

(১১) *শুচি*—যা অশুদ্ধ বা অযথা, তা ভক্ত কখনই স্পর্শই করেন না, এবং সেই ধরনের শুদ্ধ ভক্তকে শুধুমাত্র স্মরণ করার মাধ্যমেই মানুষ পাপকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তের সুন্দর আচরণের জন্য তাঁকে বলা হয় শুচি বা শুদ্ধ।

(১২) *অকিঞ্চন*—ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুর অধিকার রক্ষার আগ্রহ থেকে মুক্ত থাকেন এবং কোনও কিছু ভোগ বা ত্যাগ করতেও আগ্রহ বোধ করেন না, যেহেতু তিনি মনে করেন সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পদ।

(১৩) *অনীহ*—ভগবদ্ভক্ত কখনও আপন উদ্যোগে কোনও কিছু করেন না, শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্যোগে যা কিছু প্রয়োজন সবই করেন। তার ফলে তিনি অতি সাধারণ, জড়জাগতিক বিষয় ব্যাপারাদি থেকে মুক্ত থাকেন।

(১৪) *মিতভুক্*—ভগবদ্ভক্ত জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়বস্তু যতটুকুমাত্র একান্ত প্রয়োজন, তাই গ্রহণ করে থাকেন, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম রাখা চলে। তাই তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ভোগের কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়েন না এবং কখনই তাঁর আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির প্রয়াস ব্যাহত করেন না। যখনই প্রয়োজন, তখনই ভগবদ্ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর আপন মান-মর্যাদার অনুকূলে কোনও কিছু গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন না।

(১৫) *শান্ত*—ভগবানের সৃষ্টি সমগ্র যারা আত্মসাৎ করতে চায়, তারা সর্বদাই বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই সেই ধরনের অহেতুক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পারেন যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের

প্রবৃত্তি একেবারে বিপরীতভাবেই যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞান অর্জনের স্বার্থের পরিপন্থী। সদা সর্বদাই তিনি ভগবানের অভিলাষ অনুসারে যথোপযুক্ত ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োজিত থাকেন বলে, তিনি নিয়ত প্রশান্ত থাকেন।

(১৬) *স্থির*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর মূল, তা স্মরণের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্ত ভীতিগ্রস্ত কিংবা চঞ্চলমতি হন না।

(১৭) *মৎ-শরণ*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষ ভিন্ন অন্য কোনও কিছুতেই ভগবদ্ভক্ত তৃপ্তি বোধ করেন না এবং নিত্যনিয়ত সেইভাবেই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তিনি মনোনিবেশ করে থাকেন। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন এবং যথাযোগ্য কাজে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম।

(১৮) *মুনি*—ভগবদ্ভক্ত চিন্তাশীল হন এবং বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর পারমার্থিক অগ্রগতির পথ থেকে বিচ্যুত না হতে সচেষ্ট থাকেন। বুদ্ধি সহকারে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন করেন এবং অচঞ্চলভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে জীবনের সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকেন।

(১৯) *অপ্রমত্ত*—পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হলে মানুষের অল্পবিস্তর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে তাঁর সকল কাজকর্ম উৎসর্গ করার মাধ্যমে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

(২০) *গভীরাত্মা*—যেহেতু ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত সাগরে অবগাহন করেন, তাই তাঁর নিজের চেতনসত্তা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর মর্যাদা লাভ করতে থাকে; সাধারণ পর্যায়ের গতানুগতিক ক্রিয়াকর্মের অধীন মানুষেরা জড়জাগতিক স্তরে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ হয়ে থাকে বলেই, ভগবদ্ভক্তের চেতনার গভীরতা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না।

(২১) *ধৃতিমান্*—জিহ্বা এবং উপস্থ বেগ প্রশমনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্ত ধীরস্থির ও শান্ত হয়ে থাকেন এবং ভাবাবেগে কোনও অবস্থায় অকস্মাৎ পরিবর্তন করেন না।

(২২) *জিতষড়্গুণ*—পারমার্থিক জ্ঞান উন্মেষের মাধ্যমে, ভগবদ্ভক্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক দুঃখ, মায়ামোহ, জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর ভাবাবেগ জয় করতে পারেন।

(২৩) *অমানী*—ভগবদ্ভক্ত গর্বোদ্ধত হন না এবং তিনি প্রখ্যাত হলেও, সেই খ্যাতির বিষয়ে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

(২৪) *মানদ*—প্রত্যেকেই যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, তাই ভগবদ্ভক্ত তাদের সকলকেই পূর্ণ মর্যাদা অর্পণ করে থাকেন।

(২৫) *কল্য*—ভগবদ্ভক্ত সকল মানুষকেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করাতে দক্ষতা অর্জন করেন।

(২৬) *মৈত্র*—ভগবদ্ভক্ত কখনই কোনও মানুষকে জীবনের দেহভোগ সম্পৃক্ত বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে বঞ্চনা করেন না; বরং, তাঁর প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে ভক্তজন প্রত্যেক মানুষেরই বন্ধু হয়ে ওঠেন।

(২৭) *কারুণিক*—ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই মানুষকে সুস্থির চিত্ত হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেন এবং তাই বাস্তবিকই তিনি বিশেষ কৃপাময়। তিনি পরদুঃখে দুঃখী হন, তাই কারও দুঃখ দেখলে তাঁর গভীর দুঃখ বোধ হয়।

(২৮) *কবি*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী অনুশীলনে ভগবদ্ভক্ত বিশেষ পারদর্শী হন এবং ভগবানের আপাত বিরোধী গুণাবলীর সামঞ্জস্য ও প্রয়োগশীলতা বোঝাতে পারেন। ভগবানের পরম প্রকৃতির সুচারু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোলাপের চেয়েও কোমল এবং বজ্রের চেয়েও কঠিন, কিন্তু এই সকল পরস্পরবিরোধী গুণাবলী ভগবানের অপ্রাকৃত দিব্য প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। কোনও প্রকার বিরোধিতা বা অস্পষ্টতা ব্যতিরেকেই, কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সর্বদাই যে সক্ষম হয়, তাকে আমরা কবি অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি বলে থাকি।

উপরিউক্ত গুণাবলী বিকাশের তারতম্য অনুসারেই পারমার্থিক পথে মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত, যেহেতু ভগবানই তাঁর একান্ত ভক্তকে সকল প্রকার সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের সর্বপ্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা নিয়েই শুরু করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সকল কাজের ফল ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাকে। এই ভক্তিস্তরটিকে বলা হয়েছে *কর্মমিশ্রা ভক্তি*। মানুষ ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে ক্রমশই নিজেকে যত পরিশুদ্ধ করে তুলতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ জ্ঞান উপলব্ধির মাধ্যমে অনাসক্তি অর্জন করতে থাকে এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তিলাভ করে। এই সময়ে সে দিব্য জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে এবং তাই এই পর্যায়টিকে বলা হয়ে থাকে *জ্ঞানমিশ্রাভক্তি* অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের ফল আস্বাদনের অভিলাষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের প্রয়াস। কিন্তু যেহেতু শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম বাস্তবিকই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ এবং জীবের স্বাভাবিক মর্যাদারই লক্ষণ তাই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ক্রমশ তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ এবং জ্ঞান অর্জনের অভিলাষ বর্জন করতে থাকে এবং শুদ্ধ ভক্তিমার্গে উত্তরণে প্রয়াসী

হয়, যার মধ্যে নিজসুখের কোনও বাসনা থাকে না। *ন কর্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্মভিস্ত্যজতে হি সঃ*—"যোগী পুরুষ কখনই তাঁর ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করেন না, তবে অনাসক্তির মাধ্যমে জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ হ্রাস পেতে থাকে।" অন্যভাবে বলা চলে যে, নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম অবশ্যই পালন করে চলা উচিত, তা যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে উন্নতির জন্য পরমাগ্রহী হয়, তা হলে ভক্তিযোগের শক্তির মাধ্যমে তার কাজকর্ম ক্রমশই শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবা অনুশীলনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে।

ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের শক্তি অর্জনের মাধ্যমে সকাম কর্মীরা, মানসিক কল্পনাকারী দার্শনিকেরা এবং জড়জাগতিক ভোগবিলাসী ভক্তেরা শুদ্ধ সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছেন, এমন অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখানুভূতি উপভোগ এবং যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও কিছুর অভাব থাকে না, এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা দার্শনিক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও কোনও প্রকার অতিরিক্ত প্রচেষ্টার আবশ্যক হয় না। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই তার জীবনে সর্বপ্রকার সার্থকতা অর্জন করবে, এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস অবশ্যই থাকা চাই। উপরোক্ত গুণাবলীর কিছু বা কোনটাই যদি কারও অভাব থাকে, তবু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আন্তরিকভাবে তার আত্মনিয়োগ করা উচিত, এবং তা হলে ক্রমশ তার আচার-আচরণ শুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাবান ভক্ত ক্রমশই ভগবানের কৃপাতেই সকল প্রকার দিব্য গুণাবলীর বিকাশ লাভে সক্ষম হবে, এবং উপরোক্ত গুণাবলী সহকারে ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োজিত মানুষ অচিরেই পরম ভক্ত রূপে পরিগণিত হতে পারবে। ৩২ সংখ্যক শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—যে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বর্ণাশ্রম প্রথার অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যকর্মগুলি প্রতিপালনের পুণ্য সুফল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হয়েই থাকেন, এবং তেমনই তিনি ঐ সকল কর্তব্যকর্মে অবহেলার মারাত্মক ত্রুটির কথাও অবহিত থাকেন। তা সত্ত্বেও, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, ভগবদ্ভক্ত সর্বপ্রকার সাধারণ সামাজিক ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সবই বর্জন করেন এবং পরিপূর্ণভাবে শুধুমাত্র ভক্তিসেবামূলক ক্রিয়াকর্মেই আত্মনিয়োগ করে থাকেন। তিনি জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর পরম উৎস এবং একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকেই সকল প্রকার সার্থকতা উৎসারিত হয়। ভক্তের সেই

অসামান্য বিশ্বাসের ফলেই ভক্তকে বলা হয় *সত্তম*, অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যে সর্বোত্তম।

তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *'উপদেশামৃত'* রচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে, উল্লিখিত সদ্‌গুণাবলী যে ভক্তের মধ্যে এখনও বিকশিত হয়নি, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে তাঁর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে, তিনি অবশ্যই অগ্রণী বৈষ্ণবভক্তদের সঙ্গ মাধ্যমে কৃপালাভ করবেন। তার জন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত কোনও ভক্তের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের প্রয়োজন হবে, এমন কথা নয়, তবে তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যনাম জপকীর্তনের মাধ্যমেই যে কোনও মানুষ অবশেষে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে অবশ্যই পারবে। এই শ্লোকগুলিতে বর্ণিত সজ্জন মানুষে সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে সামাজিক পরিবেশ কত সুন্দর হয়ে উঠবে, তা কল্পনা করা যায়। উপরে বর্ণিত চমকপ্রদ কৃষ্ণভাবনাময় গুণাবলীই সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ এবং প্রত্যেক মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবা নিবেদনে অভ্যস্ত হলে, অবশ্যই বর্তমান যুগের ভয়, হিংসা, কামনা, লোভ আর মস্তিষ্ক বিকৃতিপূর্ণ সমাজের পরিবর্তে দিব্য পরিবেশ রচিত হবে, যেখানে নেতৃস্থানীয় এবং সকল নাগরিকই সুখী হতে পারবে। এখানে মূল বিষয়টি এই যে, *মৎ-শরণ* হতে হবে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য স্মরণ করা উচিত। এবং *মাং* ভজেত (সকলকেই ভগবানের আরাধনা করতে হবে)। এইভাবেই সমগ্র পৃথিবী *সত্তম্* অর্থাৎ সার্থক হয়ে উঠতে পারবে।

শ্লোক ৩৩

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞাত্বা—জানার ফলে; **অজ্ঞাত্বা**—না জানার ফলে; **অথ**—এইভাবে; **যে**—যারা; **বৈ**—অবশ্যই; **মাম্**—আমাকে; **যাবান্**—যেন; **যঃ**—যে; **চ**—ও; **অস্মি**—আমি; **যাদৃশঃ**—যেমন আমি; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **অনন্য-ভাবেন**—অনন্যমনে ভক্তিভাবে; **তে**—তারা; **মে**—আমার দ্বারা; **ভক্ততমাঃ**—উত্তম ভক্তগণ; **মতাঃ**—বিবেচিত হয়।

অনুবাদ

আমার ভক্তবৃন্দ হয়ত জানতে পারে কিংবা যথার্থভাবে না জানতেও পারে—আমি কি, আমি কে এবং আমি কিভাবে বিরাজ করি, কিন্তু তবু যদি তারা অনন্য

প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, তখন আমি তাদের ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মনে করে থাকি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, *যাবান্* শব্দটি যদিও বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই মহাকাল বা মহাশূন্যের দ্বারা আবদ্ধ বা সীমিত হয়ে থাকতে পারেন না, তবে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণের প্রেমভক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়েই পড়েন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই একটি পদক্ষেপও বৃন্দাবনধামের বাইরে রাখেননি, কারণ ব্রজবাসীদের একান্ত গভীর প্রেম ভালবাসা তাঁর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। এইভাবেই, ভগবান তাঁর ভক্ত সমাজের প্রেমাকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। *যঃ* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব হলেও বসুদেবের পুত্রসন্তান হয়ে অর্থাৎ শ্যামসুন্দর রূপে আবির্ভূত হন। *যাদৃশ* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান *আত্মারাম,* অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আত্মতুষ্ট হয়েই থাকেন, এবং *আপ্তকাম,* অর্থাৎ "যিনি আপনা হতেই তাঁর অভিলাষাদি সবই পূর্ণ করে থাকেন।" তা সত্ত্বেও, ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রেমে আপ্লুত হয়ে, কখনও বা *অনাত্মারাম,* অর্থাৎ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর প্রেম ভালবাসায় নির্ভর করে থাকেন, এবং *অনাপ্তকাম,* অর্থাৎ তাঁর ভক্তসমাজের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁর অভিলাষ পূরণে অক্ষম হয়ে থাকেন। বস্তুতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্বদাই স্বতন্ত্র স্বাধীন, তবে তিনি তাঁর ভক্তসমাজের সুগভীর প্রেম ভালবাসার আদান প্রদান করে থাকেন এবং তাই যেন তিনি ভক্তমণ্ডলীর উপরে নির্ভরশীল মনে হতে পারে, ঠিক যেভাবে তিনি আপাতদৃষ্টিতে বৃন্দাবনে তাঁর শৈশব লীলাবিলাস কালে নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মাতার উপরে ভরসা করেই থাকতেন। *অজ্ঞাত্বা* (অনভিজ্ঞ, স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন) শব্দটি বোঝায় যে, কোনও সময়ে ভক্ত হয়ত পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ দর্শনতত্ত্বভিত্তিক উপলব্ধি অর্জন করতে পারেন না কিংবা প্রেমভক্তির আবেশে কিছুকালের জন্য ভগবানের মান মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে থাকতেও পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (১১/৪১) শ্রীঅর্জুন বলেছেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

"পূর্বে আমি তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে 'হে কৃষ্ণ,' 'হে যাদব,' 'হে সখা,' বলে সম্বোধন করেছি। প্রমাদবশত এবং প্রণয়বশত আমি যা কিছু করেছি, তা

তুমি দয়া করে ক্ষমা কর।" অর্জুনের *অজানতা মহিমানং* শব্দগুলি *ভাগবতের* এই শ্লোকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের *অজ্ঞাত্বা মাম্* শব্দগুলিরই সমার্থক। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যরাশির অসম্পূর্ণ উপলব্ধির অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন বলেছেন, *প্রণয়েন*—কৃষ্ণের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর যে বিস্মৃতি ঘটেছিল, কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেম ভালবাসার ফলেই তা ঘটে গিয়েছিল। এই শ্লোকটিতে, *অজ্ঞাত্বা মাম্* শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দের এই ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করেই থাকেন, অর্থাৎ ভক্তগণ যদিও শ্রীকৃষ্ণের মহিমামণ্ডিত মর্যাদা যথাযথভাবে উপলব্ধি নাও করতে পারেন, তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবা স্বীকার করে থাকেন। সুতরাং এই শ্লোকটি সুস্পষ্টভাবে ভক্তি অনুশীলনের সুউন্নত মর্যাদা অভিব্যক্ত করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১১/৫৪) বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

"হে অর্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারা যায়।"

যদিও মানুষ অগণিত সাধুজনোচিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারে, তা হলেও কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত কেউ পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করবে না। পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তাঁকে ভালবাসতে হবে। এমন কি কোনও মানুষ যদিও ভগবানের মর্যাদা বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপলব্ধি করতে না পারে, তা হলে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার মাধ্যমেই সুনিশ্চিতভাবে সে সার্থকতা অর্জন করেছে। বৃন্দাবন ধামের অনেক অধিবাসীরই কোনও ধারণা নেই যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসত্তার কিংবা অবতার বৈচিত্র্যের কথা কিছুই জানে না। তারা শুধুমাত্র তাদের মনেপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে, এবং তার ফলেই তাদের অতীব শুদ্ধ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৪-৪১

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্ ।
পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনম্ ॥ ৩৪ ॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥ ৩৫ ॥

মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্ ।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥
যাত্রা বলিবিধানং চ সর্ববার্ষিকপর্বসু ।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥ ৩৭ ॥
মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি ॥ ৩৮ ॥
সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া ॥ ৩৯ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৪০ ॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৪১ ॥

মৎ-লিঙ্গ—এই জগতে শ্রীবিগ্রহরূপে আমার আবির্ভাব ইত্যাদি; **মৎ-ভক্ত-জন**—আমার ভক্তবৃন্দ; **দর্শন**—দেখা; **স্পর্শন**—স্পর্শ করা; **অর্চনম্**—এবং অর্চনা করা; **পরিচর্যা**—একান্তভাবে সেবা করা; **স্তুতিঃ**—গুণগাথা নিবেদন; **প্রহ্ব**—প্রণিপাত; **গুণ**—আমার গুণাবলী; **কর্ম**—এবং ক্রিয়াকলাপ; **অনুকীর্তনম্**—অবিরাম গুণগান; **মৎ-কথা**—আমার বিষয়ে; **শ্রবণে**—শ্রবণের মাধ্যমে; **শ্রদ্ধা**—প্রেমের মাধ্যমে বিশ্বাস; **মৎ-অনুধ্যানম্**—নিয়ত আমার চিন্তায় মগ্নতা; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **সর্ব-লাভ**—মানুষ যা কিছু লাভ করে; **উপহরণম্**—নিবেদন; **দাস্যেন**—নিজেকে আমার দাসরূপে স্বীকারের মাধ্যমে; **আত্ম-নিবেদনম্**—আত্মসমর্পণ; **মৎ-জন্ম-কর্ম-কথনম্**—আমার জন্ম ও ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন; **মম**—আমার; **পর্ব**—জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসবে; **অনুমোদনম্**—বিপুল আনন্দ সহকারে; **গীত**—সঙ্গীতের মাধ্যমে; **তাণ্ডব**—নৃত্য করে; **বাদিত্র**—বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে; **গোষ্ঠীভিঃ**—এবং ভক্তজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে; **মৎ-গৃহ**—আমার মন্দিরে; **উৎসবঃ**—উৎসব; **যাত্রা**—অনুষ্ঠানাদি; **বলি-বিধানম্**—নৈবেদ্য অর্পণের মাধ্যমে; **চ**—ও; **সর্ব**—সর্ব প্রকারে; **বার্ষিকঃ**—বাৎসরিক; **পর্বসু**—অনুষ্ঠান পর্বাদির মধ্যে; **বৈদিকী**—বেদশাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত; **তান্ত্রিকী**—*পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **মদীয়**—আমার বিষয়ে; **ব্রত**—প্রতিজ্ঞা; **ধারণম্**—পালন করার মাধ্যমে; **মম**—আমার; **অর্চা**—শ্রীবিগ্রহ রূপে; **স্থাপনে**—প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুরক্ত; **স্বতঃ**—আপন চেষ্টায়;

সংহত্য—অন্য সকলের সঙ্গে; **চ**—ও **উদ্যমঃ**—প্রচেষ্টা; **উদ্যান**—পুষ্প উদ্যানের; **উপবন**—লতাগুল্ম; **আক্রীড়**—লীলাস্থল; **পুর**—তীর্থস্থান; **মন্দির**—এবং মন্দিরাদির; **কর্মণি**—গঠনকার্যে; **সম্মার্জন**—সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে; **উপলেপাভ্যাম্**—তারপরে জল ও গোময় সিঞ্চনের দ্বারা; **সেক**—সুগন্ধি জল সিঞ্চনের দ্বারা; **মণ্ডল-বর্তনৈঃ**—মণ্ডলাদি গঠনের মাধ্যমে; **গৃহ**—মন্দিরের অর্থাৎ আমার গৃহের; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **মহ্যম্**—আমার প্রয়োজনে; **দাস-বৎ**—দাসের মতো; **যৎ**—যা; **অমায়য়া**—দ্বিচারিতা ব্যতিরেকে; **অমানিত্বম্**—মিথ্যা অহমিকা ব্যতীত; **অদম্ভিত্বম্**—গর্বশূন্য হয়ে; **কৃতস্য**—মানুষের ভগবদ্ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ; **অপরিকীর্তনম্**—অত্যধিক প্রচার আড়ম্বর না করে; **অপি**—তা ছাড়া; **দীপ**—প্রদীপের; **অবলোকম্**—আলোক; **মে**—যা আমার অধীনস্থ; **ন**—না; **উপযুঞ্জ্যৎ**—যুক্ত হওয়া উচিত; **নিবেদিতম্**—যে সকল সামগ্রী ইতিপূর্বেই অন্য সকলকে নিবেদন করা হয়ে গেছে; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **ইষ্ট-তমম্**—অতীব আকাঙ্ক্ষিত; **লোকে**—জড়জাগতিক পৃথিবীতে; **যৎ চ**—এবং যা কিছু; **অতি-প্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **আত্মনঃ**—নিজের; **তৎ তৎ**—সেই জিনিস; **নিবেদয়েৎ**—নিবেদন করা উচিত; **মহ্যম্**—আমার উদ্দেশ্যে; **তৎ**—সেই নিবেদন; **আনন্ত্যায়**—অনন্ত জীবনের জন্য; **কল্পতে**—যোগ্যতা অর্জন করে।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, নিম্নরূপ ভক্তি সেবামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ তার মিথ্যা অহমিকা ও মর্যাদাবোধ পরিত্যাগ করতে পারে। শ্রীবিগ্রহের আকারে আমার রূপের প্রতি এবং আমার শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর প্রতি দর্শন, স্পর্শন, বন্দন, সেবা এবং গুণকীর্তন ও প্রণিপাতের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, আমার দিব্য গুণাবলী এবং ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন করা, আমার গুণগাথা প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করা এবং আমার চিন্তায় নিত্য মগ্ন থাকা উচিত। যা কিছু অর্জন করা যায়, তা সবই আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত এবং নিজেকে আমার নিত্য সেবকরূপে স্বীকার করা কর্তব্য, যাতে আমার উদ্দেশ্যেই নিজের সবকিছু উৎসর্গ করা যেতে পারে। আমার জন্ম ও কর্ম বিষয়ে সদাসর্বদা আলোচনা ও ধ্যান করা এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা আমার লীলা পরিচয়ের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, সেইগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করা উচিত। আমার মন্দিরেও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের সাথে সম্মিলিতভাবে আমার বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এবং নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করাও উচিত। উৎসব-অনুষ্ঠান,

তীর্থভ্রমণ এবং পূজা নিবেদনাদির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বার্ষিক জনসমাবেশের উদ্‌যাপন করা উচিত। একাদশী তিথি উদ্‌যাপনের মতো ধর্মানুষ্ঠানগুলিও পালন করা প্রয়োজন এবং বৈদিক শাস্ত্রাদি, পঞ্চরাত্র তথা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণাদি অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। বিশ্বাস ভরে, এবং প্রেমসহকারে আমার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানানো উচিত, এবং আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এককভাবে কিংবা অন্য সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় মন্দির গঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং পুষ্পকানন, ফলের বাগান ও আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উপযোগী বিশেষ অঞ্চল গঠন করা উচিত। কোনও প্রকার দ্বিচারিতা ব্যতিরেকে, আমার বিনীত সেবকরূপে নিজেকে চিন্তা করতে শেখা উচিত, এবং সেইভাবে আমার গৃহস্বরূপ মন্দির মার্জনায় সহযোগিতা করাও কর্তব্য। প্রথমে সম্মার্জনা ও ধুলি পরিষ্কার করা উচিত এবং তার পরে গোময় ও জল দিয়ে আরও পরিচ্ছন্ন করা উচিত। মন্দির শুষ্ক করার পরে, মন্দিরে সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা উচিত এবং মণ্ডলচিত্র তথা, আলপনা অঙ্কনের দ্বারা মন্দির শোভিত করা প্রয়োজন। এইভাবেই আমার সেবকরূপে কাজ করা উচিত। কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার ভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞাপিত করবে না; সেইভাবেই তার সেবা কার্য থেকে মিথ্যা অহমিকা সৃষ্টি হবে না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপগুলি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হবে না, সেইভাবেই অন্য ব্যক্তিকে নিবেদিত বা অন্য জনের ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী কখনই আমাকে নিবেদন করা উচিত নয়। এই জগতে যা কিছু নিজের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, এবং যা কিছু সবচেয়ে প্রিয়, তা সবই আমাকে নিবেদন করা উচিত। সেই ধরনের উৎসর্গের ফলেই মানুষ নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ জীবন লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

তাৎপর্য

এই আটটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণভাবে সাধুজনোচিত গুণাবলীর আলোচনা সম্পন্ন করেছেন এবং ভগবদ্ভক্তদের বিশেষ লক্ষণাদি উল্লেখ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে এখানে এবং *ভগবদ্গীতার* মধ্যেও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠাই জীবনের পরম লক্ষ্য। এখানে ভগবান বিশদভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সবকিছুই তাঁরই উত্তম সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য পাঠিয়েছেন," তাই চিন্তা করেই মানুষের যা কিছু সঞ্চয়, সবই ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হয়। অবশ্যই বোঝা উচিত যে, অনুকণা পরিমাণ

চিন্ময় আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র, এবং তাই নিজেকেই ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা কর্তব্য। সচরাচর কোনও ভৃত্য যেভাবে তার মনিবের কাছে বিনীত এবং আজ্ঞাবহ হয়েই থাকে, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ স্বরূপ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছেও ভক্তকে সদাসর্বদা বিনীত হয়ে থাকতে হয়। ভক্তের উপলব্ধি করা উচিত যে, তার গুরুদেবকে শুধুমাত্র দর্শনের মাধ্যমেই কিংবা গুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্যস্বরূপ জল নিজের মাথায় ধারণ করলেই, কিভাবে তার দেহ ও মন পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই শ্লোকাবলীর মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বৈষ্ণব উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করা উচিত। যতদূর সম্ভব, বৃহৎ উৎসবগুলি সারা জগতের সর্বত্র পালন করা উচিত যাতে মানুষ ক্রমশ সার্থক মানব জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হয়, তা ক্রমশ শিক্ষালাভ করতে পারে। *মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা* শব্দগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর শ্রীবিগ্রহসেবায় মানুষের বিশ্বাস ভরসা থাকা উচিত, যেহেতু ভগবান স্বয়ং শ্রীবিগ্রহরূপে বিরাজ করেন। *উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি* শব্দসমষ্টি বোঝায় যে, সুন্দর সুন্দর মন্দির এবং প্রচুর উদ্যান, লতাগুল্ম ও পুষ্পকানন সহ বৈষ্ণব নগরী গড়ে তোলার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা থাকা উচিত। সম্প্রতি এই ধরনের প্রচেষ্টার একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বর্তমান কালে ভারতবর্ষের শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির গঠনের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে।

দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ শব্দসমষ্টির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীবিগ্রহের উপকরণাদি কিছুই নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা অনুচিত। যদি বিদ্যুৎ কিংবা আলোর অভাব ঘটে তা হলে শ্রীবিগ্রহের নির্ধারিত প্রদীপ ব্যবহার করা চলে না, কিংবা যে সামগ্রী ইতিপূর্বে অন্য কোনও জনকে অর্পণ করা হয়ে গিয়েছে, তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিবেদন করা চলে না। এই শ্লোকগুলির মাধ্যমে, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা এবং বৈষ্ণব উৎসব অনুষ্ঠানাদির উপযোগিতা নানাভাবে গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেছেন যে, এই কর্তব্যকর্মগুলি নিষ্ঠাভরে যে পালন করে থাকে, সে অবশ্যই তার নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবে (*তদানন্ত্যায় কল্পতে*)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় যে সামগ্রী, সেইগুলি ছাড়া, নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা উচিত। যদি নিজের পরিবার পরিজনই পরম আসক্তির বিষয় বলে মনে হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সেই সমগ্র পরিবারবর্গকেই নিয়োজিত করা উচিত। যদি কেউ অর্থসম্পদে বেশি আসক্ত হয়ে থাকে, তবে সেই সবই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে দান করা উচিত। আর যদি

কেউ মনে করে যে, তার বুদ্ধি বেশি মূল্যবান, তবে সেই বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে যুক্তি তর্কের সাহায্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করাই তার কর্তব্য। যদি আমাদের পরম মূল্যবান সম্পদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করি, তা হলে স্বতস্ফূর্তভাবে আমরা ভগবানের প্রিয়জন হয়ে উঠব এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারব।

শ্লোক ৪২

সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্ ।
ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ৪২ ॥

সূর্যঃ—সূর্য; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **গাবঃ**—গাভীগণ; **বৈষ্ণবঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **খম্**—আকাশ; **মরুৎ**—বায়ু; **জলম্**—জল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **আত্মা**—জীবাত্মা; **সর্ব-ভূতানি**—সকল জীবগণ; **ভদ্র**—হে উদ্ধব; **পূজা**—আরাধনা; **পদানি**—স্থানগুলিতে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

হে সজ্জন উদ্ধব, তুমি জেনে রাখো যে, সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণগণ, গাভীকুল, বৈষ্ণবজন, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, জীবাত্মা এবং সকল জীবগণের মাধ্যমে তুমি আমাকে আরাধনা করতে পার।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী এবং ভগবানের মধ্যেই সবকিছু অবস্থান করে আছে, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারলে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভিজ্ঞতা অতীব নিম্ন পর্যায়ের ও জড়জাগতিক ভাবাপন্ন অনুভূতিমাত্র হয়েই থাকবে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম তত্ত্বই সব কিছুর উৎস। সব কিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, এবং তিনিও সব কিছুর মধ্যে বিরাজিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, কারও পক্ষেই চিন্তা করা অনুচিত যে, ভগবান কোনও একটি বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। বরং, মানুষ মাত্রেরই বোঝা উচিত যে, তিনি সকল সময়েই এবং সকল স্থানেই বিরাজ করছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুরই মধ্যে অনুসন্ধান করে পাওয়া যেতে পারে। *পূজা পদানি* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তবে তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সর্বব্যাপী মর্যাদা সুস্পষ্ট করেছেন এবং পূর্ণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান অর্জনের পথ প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৪৩-৪৫

সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্ ।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥ ৪৩ ॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ ॥ ৪৪ ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি ।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥ ৪৫ ॥

সূর্যে—সূর্যের আলোকের মধ্যে; **তু**—অবশ্য; **বিদ্যয়া ত্রয্যা**—নির্বাচিত বৈদিক শ্লোকাবলীর মাধ্যমে বন্দন, আরাধনা ও প্রণিপাতের নিবেদন; **হবিষা**—শুদ্ধ ঘৃত মাখনাদি অর্পণ; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **যজেত**—আরাধনা করা উচিত; **মাম্**—আমাকে; **আতিথ্যেন**—অনাহুত হলেও অতিথিগণকে শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনার মাধ্যমে; **তু**—অবশ্য; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **অগ্র্যে**—সর্বগুণে; **গোষু**—গাভীদের; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **যবস-আদিনা**—তাদের প্রতিপালনের জন্য ঘাস এবং অন্যান্য সামগ্রী প্রদান; **বৈষ্ণবে**—বৈষ্ণবজনের মধ্যে; **বন্ধু**—প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের মাধ্যমে; **সৎ-কৃত্যা**—সম্মানিত করার মাধ্যমে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **খে**—আকাশের মধ্যে; **ধ্যান**—ধ্যানের মধ্যে; **নিষ্ঠয়া**—মগ্ন হয়ে; **বায়ৌ**—বায়ুতে; **মুখ্য**—অতি প্রয়োজনীয়; **ধিয়া**—বুদ্ধি সহকারে বিবেচনার পরে; **তোয়ে**—জলে; **দ্রব্যৈঃ**—জড়জাগতিক বিষয়াদির দ্বারা; **তোয়-পুরঃ-সরৈঃ**—জল ইত্যাদির দ্বারা; **স্থণ্ডিলে**—মাটিতে; **মন্ত্র-হৃদয়ৈঃ**—গুপ্ত মন্ত্রাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে; **ভোগৈঃ**—জড়জাগতিক ভোগ্য বিষয়বস্তু আদি সমর্পণের মাধ্যমে; **আত্মানম্**—জীবাত্মা; **আত্মনি**—শরীরের মধ্যে; **ক্ষেত্রজ্ঞম্**—পরমাত্মা; **সর্ব-ভূতেষু**—সকল জীবের মধ্যে; **সমত্বেন**—তাঁকে সর্বত্র সমানভাবে দর্শন করার মাধ্যমে; **যজেত**—ভজনা করা উচিত; **মাম্**—আমাকে ।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, নির্দিষ্ট বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে এবং পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন সহকারে সূর্যের আলোকের মধ্যে আমার বন্দনা করা উচিত। অগ্নির মধ্যে ঘৃতাহুতি অর্পণের মাধ্যমেও আমাকে পূজা করা যায়, এবং ব্রাহ্মণেরা অনাহুত হলেও অতিথির মতোই তাঁদের শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের মাঝেও আমাকে পূজা করা চলে। গাভীদের তৃণ এবং অন্যান্য শস্যাদি সহ তাদের সন্তুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে উপকরণাদি প্রদানের মাধ্যমে তাদের মাঝেও আমার পূজা অর্চনা করা চলে, এবং বৈষ্ণবদের প্রতি প্রেমময় সখ্যতা জানিয়ে এবং

সর্বপ্রকার শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের মান্যতা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে বন্দনা করতে পারা যায়। নিষ্ঠাভরে অচঞ্চলভাবে ধ্যান জপের মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার অর্চনা করা চলে, এবং প্রাণ বায়ু সকল উপাদানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে বায়ুর মধ্যেও আমার বন্দনা করা যায়। জলের মাঝেও আমাকে শুধুমাত্র জল এবং ফুল-তুলসী নিবেদনের সাহায্যেও পূজা করা চলে, এবং মাটির মধ্যেও যথোপযুক্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আমাকে অর্চনা করতে পারে। খাদ্য সামগ্রী ও ভোগ্য বিষয়াদি অর্পণের মাধ্যমে যে কোনও জীবের মধ্যেও পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে বন্দনা করা যায়, এবং সকল জীবের মধ্যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে, তাদের সকলের মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে সকল জীবের মধ্যেই আমার পূজা করা উচিত।

তাৎপর্য

বিশেষ গুরুত্ব সহকারে, ভগবান এই তিনটি শ্লোকে মর্যাদা আরোপ করে বলেছেন যে, সর্ব জীবের মধ্যে সম্প্রসারিত পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আরাধনা করা উচিত। ভগবানকে পরম সত্তা ছাড়া অন্য কোনও জড়জাগতিক কিংবা পারমার্থিক বস্তুবিষয়াদিকে মর্যাদা প্রদানের অনুমোদন করা হয় নি। ভগবানের সর্বব্যাপ্ত গুণবৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে অবিচল চেতনার অনুধ্যান সহকারে মানুষ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই আরাধনার মানসিকতায় মগ্ন থাকতে পারে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনে সকল প্রকার জড়জাগতিক ও পারমার্থিক বিষয়বস্তু সবই অতি স্বাভাবিকভাবে উপযোগের প্রয়াস করতে থাকবে। যদি অজ্ঞানতাবশে কেউ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে থাকে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসঙ্গ বিহীন শক্তিশালী জড়জাগতিক রহস্যবৈচিত্র্যগুলিকেই পূজা-আরাধনা করতে আকৃষ্ট হতে পারে, কিংবা হয়তো নিজেকেই পরম পুরুষ মনে করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই সুস্থির মস্তিষ্কে সব কিছুর মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি স্বীকার করা উচিত।

শ্লোক ৪৬

ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ধিষ্ণ্যেষু—পূর্বে উল্লিখিত অর্চনা কেন্দ্রগুলিতে; **ইতি**—এইভাবে (পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াদি অনুসারে); **এষু**—তাদের মধ্যে; **মৎ-রূপম্**—আমার দিব্য রূপ; **শঙ্খ**—শঙ্খের দ্বারা; **চক্র**—সুদর্শন চক্র; **গদা**—গদা, মুদ্গর; **অম্বুজৈঃ**—এবং পদ্ম; **যুক্তম্**—ভূষিত;

চর্তুঃভুজম্—চতুর্ভুজ; **শান্তম্**—শান্ত; **ধ্যায়ন্**—ধ্যানমগ্ন; **অর্চেৎ**—অর্চনা করা উচিত; **সমাহিতঃ**—পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

এইভাবে পূর্বে উল্লিখিত অর্চনাকেন্দ্রগুলিতে এবং আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, আমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী প্রশান্ত রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবেই, একাগ্র মনোযোগে আমার পূজা অর্চনা করা বিধেয়।

তাৎপর্য

ভগবান ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভক্তদের কাছে তিনি বিভিন্ন দিব্য রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, যাতে তাদের ভগবৎপ্রীতির অপরিসীম বিকাশ সাধিত হতে পারে। এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপের সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে রূপটি সমগ্র জড় জগৎব্যাপী পরমাত্মারূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তেরা অবশ্য অন্তরের মাঝে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হন না, বরং শ্রীরাম কিংবা শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের বিশেষ কোনও দিব্য আকৃতির উদ্দেশ্যে সক্রিয় সেবা নিবেদন করে থাকেন, এবং সেইভাবেই ভগবান তথা পরমেশ্বর সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি সার্থক করে তোলেন এবং তখন ভগবানও চিন্ময় জগতে তাঁর ভক্তবৃন্দের সাথে দিব্যলীলায় আত্মনিয়োগ করেন। তা সত্ত্বেও, জড়জগতের সব কিছুর মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান লক্ষ্য করার মাধ্যমে আপন জীবনস্থিতির পারমার্থিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে মানুষ পারে এবং তার ফলে নিত্যনিয়তই তাঁর অনুধ্যানের মাধ্যমে তাঁকে ভজনা করতে সক্ষম হয়। পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী মন্দিরে গিয়েও বিশেষভাবে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং দিব্য উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। যেহেতু সমগ্র প্রকৃতির মধ্য দিয়েই ভগবানের অনুধ্যানে নিত্য নিয়োজিত থাকা যায়, সেইজন্য গর্ব করা অনুচিত যে, মন্দিরে গিয়ে ভগবানের পূজা নিবেদনের প্রয়োজন আর নেই। স্বয়ং ভগবান বারে বারে মন্দিরে পূজা নিবেদনের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত *সমাহিত* শব্দটির দ্বারা সমাধি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় সযত্ন হলে কিংবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন অনুশীলন করলে মানুষ অবশ্যই সমাধি ভাব অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের পূজা-আরাধনা ও দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করলে মানুষ মুক্ত জীবাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এবং ক্রমশই জড় সৃষ্টির প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে। জীবকে আত্মা অর্থাৎ নিত্য সত্তা বলা হয়, যেহেতু পরমাত্মা স্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে তার নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। ভগবানের

আরাধনার মাধ্যমেই আমাদের নিত্যশুদ্ধ প্রকৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের কার্যক্রমে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দৃঢ়চিত্ত মনোভাব যতই বৃদ্ধি করতে থাকি, ততই আমাদের জড়জাগতিক অস্তিত্বের মায়ামোহ ম্লান হয়ে যেতে থাকে।

শ্লোক ৪৭

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ৪৭ ॥

ইষ্টা—আপন কল্যাণার্থে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; **পূর্তেন**—এবং কূপ খনন ইত্যাদি জনকল্যাণকর পুণ্যকর্মাদি; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এইভাবে; **যঃ**—যিনি; **যজেত**—পূজা করেন; **সমাহিতঃ**—আমাতে মন সন্নিবদ্ধ করার মাধ্যমে; **লভতে**—সেই ধরনের মানুষ লাভ করে থাকেন; **ময়ি**—আমার মাঝে; **সৎ-ভক্তিম্**—অবিচল ভগবদ্ভক্তি সেবা; **মৎ-স্মৃতিঃ**—আমার সম্পর্কে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি; **সাধু**—সকল প্রকার সৎ গুণাবলী সহ; **সেবয়া**—সেবার মাধ্যমে।

অনুবাদ

আমার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ পূজাপার্বণাদি এবং পুণ্যকর্ম সাধন যিনি করেন এবং সেইভাবে অনন্যচিত্তে আমাকে আরাধনা করে থাকেন, তিনি আমার প্রতি অবিচল ভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত ঐভাবে তাঁর সেবার অনন্য গুণাবলীর ফলে আমার সম্পর্কে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

ইষ্টাপূর্তেন শব্দটির অর্থ "যাগযজ্ঞাদি পূজা অনুষ্ঠান এবং পুণ্য কর্ম" বলতে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন থেকে বিচ্যুতি বোঝায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে যজ্ঞ বলা হয়, অর্থাৎ তিনি সকল যজ্ঞের প্রভু, এবং *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*—"আমি সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের যথার্থ ভোক্তা"। সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলতে ভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনই বোঝায়, এবং ভগবানের নামের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে, পরমতত্ত্বের শুদ্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এবং অবিচল ভগবদ্ভক্তি অর্জিত হয়। যে কোনও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে অতীব মনোযোগী হয়ে থাকেন এবং সেই বিষয়ে মনপ্রাণ নিবেদন করে থাকেন। শ্রীগুরুদেব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমলের নিত্য আরাধনা এবং গুণ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুষ্ঠানে নিজেকে অভিনিবিষ্ট রেখে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের সেবায়

অবিচল থাকেন। এই ধরনের হরিনাম কীর্তন এবং গুরুপূজা অনুষ্ঠানগুলিই একমাত্র বাস্তবমুখী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়। যখন সেই হরিনাম কীর্তন সম্প্রসারিত হয়, তখন তাকে বলা হয় কৃষ্ণ সংকীর্তন। অননুমোদিত কৃচ্ছ্রতা সাধন কিংবা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শুষ্ক প্রচেষ্টায় কালক্ষেপ করা অনুচিত, বরং প্রবল উৎসাহে মহাযজ্ঞস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ উৎসাহ উদ্যম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যার ফলে মানব জীবনের সর্বোচ্চ পরম সার্থকতা অনায়াসে অর্জন করতে সমর্থ হয়।

শ্লোক ৪৮

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব ।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ৪৮ ॥

প্রায়েণ—সকল বাস্তব উদ্দেশ্য অনুযায়ী; **ভক্তি-যোগেন**—আমার উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ সেবা উদ্যোগে; **সৎ-সঙ্গেন**—আমার ভক্তগণের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে যা সম্ভব হয়; **বিনা**—ব্যতীত; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ন**—না; **উপায়ঃ**—কোনও পন্থা; **বিদ্যতে**—আছে; **সম্যক্**—যা যথার্থ কার্যকর; **প্রায়ণম্**—জীবনের যথার্থ পন্থা বা যথার্থ আশ্রয়; **হি**—যেহেতু; **সতাম্**—মুক্তাত্মা পুরুষগণের; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, আমিই স্বয়ং সাধুভাবাপন্ন মুক্তাত্মা পুরুষগণের পরম আশ্রয় এবং জীবনের গতি, এবং তাই যদি আমার প্রতি তারা প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হয়, আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে যদি তার অনুশীলন না করা হয়, তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে, জড়জাগতিক জীবনধারার অস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভের কোনই যথার্থ পন্থা তার জানা থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি, যা পারমার্থিক প্রক্রিয়াদি রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে সেইগুলি উদ্ধবকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য, এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার একমাত্র পন্থা ভক্তিযোগ, এবং সৎসঙ্গ অর্থাৎ অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ ভিন্ন ভক্তিযোগের যথার্থ অনুশীলন সম্ভব নয়। ভক্তিমিশ্র জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির সাথে পরমতত্ত্ব জ্ঞানের চিন্তাভাবনা মিশ্রিত হলে, তার ফলেও মানুষ জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দোষে কলুষিত হয়েই থাকে। কোনও প্রকার জড়জাগতিক গুণাক্রান্ত না হলে শুদ্ধাত্মা পুরুষের দার্শনিক কল্পনাবিলাসের

কোনও অভিলাষ থাকে না, কোনও কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন কিংবা নিরাকার নির্বিশেষবাদী ধ্যান অনুশীলনের প্রয়াসও থাকে না। শুদ্ধাত্মা মানুষ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাসেন এবং নিত্যনিয়ত তাঁকেই সেবা করতে চান। জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিসেবা অনুশীলনকে বলা হয় *কেবলা ভক্তি*, আর ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের সাথে দার্শনিক কল্পনাবিলাস সংমিশ্রিত হলে, তাকে বলা হয় *গুণভূত ভক্তি*, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সাথে ভগবদ্ভক্তি সেবা মিশ্রণের ফলে কলুষতাময় ভক্তিচর্চা। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি দার্শনিক তত্ত্ববিলাসের জাদু প্রদর্শন করেন না, বরং গভীর মনোযোগ সহকারে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে থাকেন এবং *কেবল-ভক্তি* অনুশীলনের পন্থাই অবলম্বন করেন। জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতি লাভের পন্থাকে যে গুরুত্ব দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে কম বুদ্ধিমান মানুষ, কারণ ঐ ধরনের শুদ্ধ আত্মার শ্রেষ্ঠতার মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে নিজের কলুষিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অধিক আস্থাশীল হয়ে থাকে। অবশ্যই বোঝা উচিত যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন পদ্ধতিও দার্শনিকতত্ত্ব বিরোধী কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধী কোনও প্রকার পন্থা নয়। পরমতত্ত্ব যে কোনও আংশিক খণ্ড তত্ত্বের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সর্বগ্রাহ্য বিষয়বস্তু। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান যার লাভ হয়েছে, তার পক্ষে দার্শনিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়ে অগ্রসর হওয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়ে আছে, কারণ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ভাবগ্রাহ্য ধারণা সমূহের বিভিন্ন ধারার সকল ক্ষেত্রেই কাজ করে চলেছেন। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমাত্মার তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু তারা এই বিষয়ে যথার্থ উপলব্ধির পরম পর্যায়ে যাঁকে ভগবান, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে অভিহিত করা হয়, তা মোটেই অবহিত নয়। ভগবান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য, ঐ ধরনের অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকেরা অবশ্যই ভগবানের অসংখ্য শক্তিরাজির বিস্তার, বিকাশ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যাহার বিষয়ক রহস্য তত্ত্ব কিছুই বোঝে না। তার ফলে সেই সকল তত্ত্বের পূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা সবই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে, দর্শনচিন্তার সম্যক উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

দার্শনিক তথা চিন্তামূলক উপলব্ধি ছাড়াও, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি থেকে জীবনের অন্যান্য জাগতিক তথা পারমার্থিক কল্যাণ সাধনও সম্ভব হয়ে ওঠে; অতএব যে কোনও কারণে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পন্থা ছাড়া

অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বন যারা করে তারা দুর্ভাগ্যবশত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধভক্তিসেবামূলক অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি পোষণ করে থাকে। এখানে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য ভগবদ্ভক্তবৃন্দের সাথে মিলিতভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রয়াস করা উচিত। অপর পক্ষে, জ্ঞানযোগ প্রক্রিয়া একক প্রচেষ্টায় অনুশীলন করতে হয়, কারণ দুজন মনস্বী ব্যক্তি তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে কোনও একই জায়গায় সমবেত হলে নিত্য কলহ কোলাহল ছাড়া তারা থাকতেই পারে না। আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিকেও ছাগলের গলায় স্তনের মতোই তুলনীয়। সেইগুলি বক্ষস্তনের মতোই দেখা যায়, কিন্তু সেইগুলি থেকে কোনও প্রকার দুধ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি, যথাক্রমে শ্রীউদ্ধব, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং শ্রীনারদ মুনির উক্তি স্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন—

তাপত্রয়েণাভিহিতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীহ ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণম্ তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাত পত্রাদ্ অমৃতাভিবর্ষাৎ ॥

"হে ভগবান, জড়জাগতিক অস্তিত্বের মায়াজালে পতিত হয়ে নানা সমস্যার জ্বলন্ত অগ্নিতে যেজন ভয়াবহভাবে দগ্ধ হচ্ছে, তার জন্য আপনার দুটি শ্রীচরণপদ্ম ছাড়া অন্য কোনও সম্ভাব্য আশ্রয় আমি লক্ষ্য করছি না, কারণ আপনার শ্রীচরণপদ্মই দুঃখের আগুন নির্বাপণে অমৃত বর্ষণ করতে পারে।" (*ভাগবত* ১১/১৯/৯)

সংসারসিন্ধুম্ অতিদুস্তরম্ উত্তিতীর্ষোঃ
নান্যঃ প্লবোভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
লীলাকথারসনিষেবণম্ অন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য ॥

"জড়জাগতিক জীবনের অস্তিত্ব দুস্তর মহাসাগরেরই মতো। জড় জীব এই সাগরে পতিত হয়েছে, যে সাগর শীতল নয়, বরং দুঃখ দুর্দশার জ্বালায় সেই সমুদ্রে দগ্ধ হতে হয়। এই সাগরে যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তা থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে, তার জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকাহিনী বর্ণনার নিয়ত আস্বাদন ভিন্ন অন্য কোনও উদ্ধার তরণী সেখানে নেই।" (*ভাগবত* ১২/৪/৪০)

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন
ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ।

কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ
ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥

"যৌগিক প্রক্রিয়া, দার্শনিক কল্পনা, নিছক জাগতিক অনাসক্তি, বা বৈদিক পাঠ অধ্যয়নের কি প্রয়োজন? বাস্তবিকই, আমাদের অস্তিত্বেরই একমাত্র উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য যে কোনও শুভ পদ্ধতি বলতে যা বোঝায়, তা কতটাই বা কার্যকরী হয়?" (*ভাগবত* ৪/৩১/১২)

যদি, এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপায়ে, ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করলে জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা সচরাচর *(প্রায়েণ)* অসম্ভব হয়, তাহলে সহজেই অনুমান করা চলে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্যতীত কলিযুগে মুক্তিলাভের সম্ভাবনার কেবলমোক্ষ কল্পনাই করা চলতে পারে। অবশ্যই সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। মানসিক কল্পনার মাধ্যমে কোনও এক ধরনের মুক্তির কথা হয়ত কেউ উদ্ভব করতে পারে, কিংবা পারস্পরিক তোষামোদীর জন্য কোন এক ধরনের নামমাত্র পারমার্থিক সমাজে হয়ত মানুষ বাস করতেও পারে, কিন্তু যদি মানুষ নিজ আলয়ে যথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী হয়, এবং কৃষ্ণলোক নামে ভগবানের অপূর্ব মনোরম রাজ্যে দর্শনার্থী হয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেই হবে এবং ভগবদ্ভক্তগণের সাথে একসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেই হবে।

শ্লোক ৪৯

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন ।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥ ৪৯ ॥

অথ—তাই; **এতৎ**—এই; **পরমম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপন; **শৃণ্বতঃ**—তোমরা যারা শ্রবণ করছ; **যদু-নন্দন**—হে প্রিয় যদুবংশীয়; **সু-গোপ্যম্**—অতি গোপনীয়; **অপি**—এমনকি; **বক্ষ্যামি**—আমি বলব; **ত্বম্**—তোমার; **মে**—আমার; **ভৃত্যঃ**—ভৃত্য; **সুহৃৎ**—কল্যাণকামী; **সখা**—এবং বন্ধু।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, হে যদুনন্দন, যেহেতু তুমি আমার সেবক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃৎ, তাই এখন আমি তোমাকে অতীব গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করব। এই সকল মহা মহারহস্যাদি সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা শোনাব।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে (১/১/৮) বলা হয়েছে—*ক্রয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত*—সদ্‌গুরু স্বভাবতই নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে সমস্ত অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান অভিব্যক্ত করে থাকেন। উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং কেবল তখনই ভগবান তাঁর কাছে ঐ সকল গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস না সৃষ্টি হলে, পারমার্থিক জ্ঞান সঞ্চার অসম্ভব। দার্শনিক কল্পনাবিলাসের মতো আত্ম উপলব্ধির অন্যান্য ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অসংগঠিত হয়ে থাকে, কারণ সেই জ্ঞানের অনুষ্ঠাতার ব্যক্তিগত বাসনা থাকে, এবং সেই সকল জ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে না যার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের পরিপূর্ণ কৃপালাভ হতে পারে। অথচ অন্য দিকে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভ করলেই তা স্বয়ং সম্পূর্ণ পন্থা স্বরূপ আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শুধুমাত্র জানা দরকার কিভাবে শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করতে হয় এবং তা হলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। এইটুকুই এই অধ্যায়টির সারমর্ম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি' নামক একাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।